ক্রুসেড

(ইতিহাস, ফলাফল, ও প্রভাবসমূহ)

মুহাম্মদ মুরশিদুল ইসলাম

দা'ওয়াহ ও তুলনামূলক ধর্মতত্ত্ব বিভাগ

জামিয়াতুল উলূমিল ইসলামিয়া, মুহাম্মদপুর, ঢাকা।

ক্রুসেডের ইতিবৃত্ত

মধ্যযুগের মাঝামাঝি সময়ে খৃস্টজগতের মহামান্য পোপের আহ্বানে ইউরোপের খৃস্টান রাজ্যসমূহ জোটবদ্ধ হয়ে মধ্যপ্রাচ্যে ইসলাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক যুদ্ধ ঘোষণা করে। বিশেষ করে সিরিয়া, ফিলিস্তীন ও মিশরে ১০৯৬-১২৯২ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত প্রায় দুইশত বছর ধরে ক্রমাগত তারা যে সকল আক্রমণ ও অভিযান পরিচালনা করে ইতিহাসে তা-ই ক্রুসেড নামে পরিচিত।

পোপ ক্রুশের নামে খৃস্টজগতকে উদ্দীপ্ত করেছিল এবং যোদ্ধারা যুদ্ধের সময় ক্রুশ ও ক্রুশের পতাকা ধারণ করত। তাই এ যুদ্ধগুলোর নাম হয় ক্রুসেড যুদ্ধ/crusades/الحرب الصليبية এবং অংশগ্রহণকারীদেরকে বলা হয় ক্রুসেডার। তারা এগুলোকে ধর্মযুদ্ধও বলে থাকে।

কোন কোন পাশ্চাত্য লেখক এই পরিভাষাটিকে ব্যাপক অর্থবোধক করা চেষ্টা করেছেন এবং মুসলিম জাতির সাথে খৃস্টানদের প্রতিটি সংঘর্ষকে ক্রুসেড আখ্যা দিয়েছেন। পরবর্তীতে অখৃস্টান বা তাদের ফতোয়া অনুসারে হেরেটিক/ অধার্মিক, মণ্ডলীচ্যুতদের বিরুদ্ধে পরিচালিত সকল যুদ্ধ, এমনকি কোন সার্থক অভিযান বা প্রয়াসের ক্ষেত্রে কিংবা উপযোগী বিবেচিত অভিযানের ব্যাপারেও এ কথাটির প্রয়োগ সম্প্রসারিত করার চেষ্টা করা হয়।

প্রসিদ্ধ ক্রুসেডের সংখ্যা ও সেগুলোর সময়কাল:

প্রসিদ্ধ ক্রুসেড সংঘটিত হয় নয়টি। ৪৮৯হি./১০৯৫খৃ. থেকে শুরু হওয়া ক্রুসেড ৬৯১হি./১২৯২খৃ. পর্যন্ত তার রোমহর্ষক ধ্বংস ও সর্বগ্রাসী তাণ্ডবলীলা দেখাতে থাকে।

খৃস্টানগণই এর সূচনা করে এবং তাদের পরাজয়ের মধ্য দিয়েই এর সমাপ্তি ঘটে।

দুইশত বছর ধরে চলমান এই ক্রুসেডগুলোকে ঐতিহাসিকগণ প্রধানত তিনটি পর্যায়ে ভাগ করেছেন-

প্রথম ভাগ: ১০৯৬-১১৪৬ পর্যন্ত বিস্তৃত, যার অন্তর্ভুক্ত হল প্রথম ক্রুসেডটি।

দ্বিতীয় ভাগ: ১১৪৬-১১৯৩ পর্যন্ত বিস্তৃত, যার অন্তর্ভুক্ত হল ২য় ও ৩য় ক্রুসেডদ্বয়।

তৃতীয় ভাগ: ১১৯৩-১২৯১ পর্যন্ত বিস্তৃত, যার অন্তর্ভুক্ত হল বাকী ক্রুসেডগুলো।

প্রথম ক্রুসেড: ১০৯৬-১০৯৯

দ্বিতীয় ক্রুসেড: ১১৪৬-১১৪৮

তৃতীয় ক্রুসেড: ১১৮৯-১১৯২

চতুর্থ ক্রুসেড: ১১৯৯-১২০৪

পঞ্চম ক্রুসেড: ১২১৭-১২২১

ষষ্ঠ ক্রুসেড: ১২২৮-১২২৯

সপ্তম ক্রুসেড: ১২৪৯-১২৫৪

অষ্টম ক্রুসেড: ১২৭০

নবম ক্রুসেড: ১২৯১

ক্রুসেডের প্রেক্ষাপটসমূহঃ

ক্রুসেডের অর্থ ধর্মযুদ্ধ করা হলেও ১০৯৫ সাল থেকে আরম্ভ করে ১২৯১ সাল পর্যন্ত চলমান ক্রুসেডগুলো কোন ধর্মের প্রতিষ্ঠা-প্রচার কিংবা রক্ষার জন্যে সংঘটিত কোন যুদ্ধক্রম ছিল না। তা ছিল ভৌগলিক ও ধর্মীয় পরিচয়ে মুসলিম ও খৃস্টান বলে চিহ্নিত দু'টি জনগোষ্ঠির মধ্যে একের বিরূদ্ধে অন্যের, প্রকৃত প্রস্তাবে মুসলিমদের বিরূদ্ধে খৃস্টানদের সীমাহীন ঘৃণা-বিদ্বেষ ও নির্মূল করে দেয়ার তীব্র বাসনার প্রকাশরূপে এক উন্মুক্ত রক্ত-খেলা, আফ্রো-এশীয় মুসলিমদের বিরূদ্ধে ইউরোপীয় খৃস্টানদের এক দানবীয় ধ্বংসোল্লাস, বৃহত্তরভাবে প্রাচ্যের বিরূদ্ধে প্রতীচ্যের এক নির্মম মোকাবেলা।খৃস্টান বাহিনীর শ্লোগানে জেরুজালেম উদ্ধারের সংকল্প উচ্চারিত থাকলেও কার্যত এসব যুদ্ধাভিযানের লক্ষ্য ছিল সমগ্র আফ্রো-এশীয় মুসলিম শক্তি তথা মুসলিম উম্মাহকে নির্মূল করার দানবীয় বাসনা। তখনকার নড়বড়ে মুসলিম রাজশক্তিকে পরাস্ত করার সাথে সাথে মুসলিম নিধনও ছিল ক্রুসেডারদের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য। যার অকাট্য প্রমাণ পাওয়া যায় তাদের দ্বারা এন্টিয়ক ও জেরুযালেম দখলের পর নির্মম গণহত্যায়।

খৃস্টানগণও স্বীকার করেন- 'এর গতি অন্যখাতে প্রবাহিত করা হয়েছিল' (খৃস্টমণ্ডলীর ইতিহাসে নারী, ১৮৮পৃ.) ।

কেন সংঘটিত হয়েছিল এসব ভয়ংকর ক্রুসেড যার মাধ্যমে অগণিত আদম সন্তানের অসহায় রক্ত-খেলায় রচিত হল মানবেতিহাসের এক চরম কলঙ্কময় অধ্যায়।

ইউরোপীয় বিখ্যাত ঐতিহাসিক হিট্টির ভাষায়- 'ক্রুসেড ছিল মুসলিম প্রাচ্যের বিরূদ্ধে খৃস্টান প্রতীচ্যের তীব্র প্রতিক্রিয়া ও ঘৃণার বহিঃপ্রকাশ'। অন্য ইউরোপীয় ঐতিহাসিক গীবনের মতে-'খৃস্টান ইউরোপের অর্বাচীন, বর্বর ও অশিক্ষিত লোকেরাই ক্রুসেডে যোগদান করে'।

মুসলিম প্রাচ্যের এমন কি কর্মকাণ্ড খৃস্টান ইউরোপের উপর এমন বিরূপ 'ক্রিয়া' সৃষ্টি করেছিল, যার 'তীব্র প্রতিক্রিয়া'রূপে সংঘটিত হল এই ধ্বংসলীলা ? রোমীয় ধর্ম-রাজ্যের অধিকর্তা পোপ দ্বিতীয় আরবানের আহ্বানে সাড়াদানকারী ইউরোপের তদানীন্তন যেসব রাজন্যবর্গ কর্তৃক সংগঠিত 'অর্বাচীন-বর্বর-অশিক্ষিত' লোকদের বাহিনী ঝাঁপিয়ে পড়েছিল প্রাচ্যের উপর, তাঁরাও কি ছিলেন অর্বাচীন, বর্বর, অশিক্ষিত ? আক্ষরিক অর্থে তা তো সত্য নয়, তাহলে?

এসব প্রশ্নের উত্তর পেতে হলে দু'টি পক্ষেরই ক্রুসেড-পূর্বকালীন সার্বিক অবস্থা, অন্য কথায় ক্রুসেডের প্রেক্ষাপট সম্পর্কে অবহিত হওয়া অনস্বীকার্য-

মুসলিম শক্তির বিরূদ্ধে এই রক্তক্ষয়ী ক্রুসেডের কারণ ছিল নানাবিধ- ধর্মীয়, রাজনৈতিক, বাণিজ্যিক, মনস্তাত্ত্বিক ইত্যাদি। নানবিধ কারণ-প্রসূত এই ক্রুসেড ছিল প্রাচ্যের মুসলিম শক্তির বিরূদ্ধে প্রতীচ্যের খৃস্টীয় শক্তির অক্ষমতাভিত্তিক আজন্ম পোষিত ঘৃণা, বিদ্বেষ ও দ্বন্দ্ব-কলহের এক চরম বহিঃপ্রকাশ।

হিজরী প্রথম শতকে আর ঈসায়ী সপ্তম শতকে খৃস্টানদের মূল দু'টি সাম্রাজ্য ছিল। একটি পাশ্চাত্য রোম সাম্রাজ্য। দ্বিতীয়টি গ্রীকসাম্রাজ্য বা পূর্ব রোম/বাইজানটাইন সাম্রাজ্য, যার রাজধানী ছিল কনস্টান্টিনোপল।। দুই সাম্রাজ্যের মধ্যকার বিবাদও ছিল মৌলিক।

সে সময়ে ইসলাম যখন একটি মজবুত শক্তিরূপে আবির্ভূত হয়ে অগ্রসর হতে থাকে তখন একদিকে বায়জানটাইন সাম্রাজ্যের সাথে তার সংঘর্ষ হয়, অপর দিকে পাশ্চাত্যের স্পেন (আন্দালুস) ও ফ্রান্সে রোমান সাম্রাজ্যের সাথে। মুসলিম সৈন্যগণ ফ্রাঙ্কদের রাজ্যের কেন্দ্রস্থল (পৈতিয়ের, ৭৩২ খৃস্টাব্দে) পর্যন্ত পৌঁছতে সক্ষম হন।

ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়- পূর্ণ-দীন ইসলামের আবির্ভাবের আগে জেরুজালেম বিভিন্ন জীবনবিশ্বাসী জাতির অধিকারে এসেছে। বিভিন্ন রাজ্য-সাম্রাজ্যের উত্থান পতনের ফলে জেরুজালেমেরও হস্তান্তর ঘটেছে। তবুও তো সেসব বিভিন্ন জীবনবিশ্বাসী জাতির মধ্যে সংঘটিত হয়নি এমন রক্তক্ষয়ী ক্রুসেড। হয়েছে শুধুমাত্র মুসলিম-শক্তির বিরূদ্ধে। তাহলে তো ধর্মীয় প্রতিহিংসাই ছিল এর প্রধানতম চালিকা শক্তি। বস্তুত ইসলামের আবির্ভাব গ্রীক ও রোমান সভ্যতার প্রতি ছিল এক বিরাট হুমকি। শুধুমাত্র মুসলিম সাম্রাজ্যের দ্রুত বিস্তৃতির জন্যে নয়, বরং তাওহীদভিত্তিক ইসলামী সংস্কৃতি-সভ্যতার বাস্তব অবদানে প্রাচীন গ্রীক ও রোমান সভ্যতার ধারা ও প্রভাব ব্যহত হচ্ছে দেখে আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়েছিল সমগ্র ইউরোপ। তাই ইসলাম ধ্বংসের উদগ্র বাসনাই ইউরোপকে উম্মাদপ্রায় করে তুলেছিল। অন্যান্য কারণ ছিল খৃস্টান সমাজকে উদ্বুদ্ধ করার উপযোগী সহায়ক মাত্র।

এডওয়ার্ড সাঈদ যথার্থই বলেছেন: “ইসলাম ইউরোপের জন্যে এক দীর্ঘস্থায়ী মানসিক আঘাত”, “পুরো পশ্চিমা সভ্যতার জন্যে এক অবিচল বিপদস্বরূপ”। দি রোড টু মক্কা” গ্রন্থের স্বনামধন্য নওমুসলিম লেখক মুহাম্মাদ আসাদ বলেন: “ইউরোপীয় সভ্যতার শৈশবাবস্থার উপর দাঁড়িয়ে আছে ইসলামের প্রতি নিদারুণ বিদ্বেষ”।

অপরদিকে খৃস্টীয় একাদশ শতকের শেষার্ধে এবং ক্রুসেড যুদ্ধের সূচনালগ্নে ইসলামী মধ্যপ্রাচ্যে কিছু বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলীর অবতারণা ঘটে যা পরবর্তীকালে ক্রুসেড যুদ্ধের মৌলিক কারণ হয়ে দাঁড়ায়-

১. বাগদাদে সেলজুক তুর্কীদের আধিপত্য ছিল এবং তাদের আধিপত্য এতটাই বৃদ্ধি পেয়েছিল যে, ৪৬২হিজরী/১০৭০ খৃস্টাব্দে তারা মিশরের ফাতেমী শাসকদের নিকট থেকে শাম অধিকার করে নেয়। ফাতেমী উযীর আফযাল বিন বদর আল জামালী তুর্কীদের বিরূদ্ধাচারণ করতে গিয়ে ক্রুসেডরদের সাথে মিলে ষড়যন্ত্র করা থেকেও বিরত থাকেনি।

২. তুর্কীগণ বায়জানটাইনীয়দেরকে এশিয়া মাইনরে এমন শোচনীয়ভাবে পরাস্ত করে যে, বাইজানটাইন সাম্রাজ্য টলটলায়মান হয়ে যায় এবং সম্রাট এশিয়া মাইনরে অবস্থিত তার অধিকৃত অঞ্চলসমূহ সেলজুকীদের হাত থেকে উদ্ধারের জন্যে বিপক্ষদলের হওয়া স্বত্ত্বেও পাশ্চাত্যের পোপের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করতে বাধ্য হন। তখনই পোপ বহু প্রতীক্ষিত সুযোগটা পেয়ে যায়।

৩. কিছু ইউরোপীয় জায়গীরদার ইউরোপে জায়গীর হারিয়ে কিংবা বিলাসিতার জন্যে সেগুলি যথেষ্ট না হওয়ায় ইসলামী প্রাচ্যে উপনিবেশ প্রতিষ্ঠার জন্যে ভাগ্য পরীক্ষায় অবতীর্ণ হয়।

৪. ইউরোপে তখন প্রচলিত ছিল অরাজকতামূলক অবস্থা সৃষ্টিকারী সামন্ত বা জায়গীর প্রথা। যার আঞ্চলিক সামন্তদের মধ্যে চলে আসছিল দুর্বিষহ দ্বন্দ্ব-কলহ। প্রত্যেক সামন্তের ছিল নিজ নিজ ক্ষুদ্র যোদ্ধাদল যা সেই দ্বন্দ্ব-কলহকে জিইয়ে রাখতে সাহায্য করত। ইউরোপের খৃস্টানদের মধ্যকার এই দ্বন্দ্ব-কলহের আগুন নেভাতে পারে এমন কোন কেন্দ্রীয় শক্তিও ছিল না। জায়গীরদার প্রথার দৈনন্দিন প্রসার ও যুদ্ধবাজ রাজন্যবর্গের ক্রমবর্ধমান শক্তি পশ্চিম ইউরোপের জন্যে দু'টি ভয়াবহ বিপদ সৃষ্টি করেছিল-একদিকে এ যুদ্ধবাজ সমাজের পারস্পরিক শত্রুতা ও বিদ্বেষের ফলে প্রচণ্ড সংঘর্ষের আশঙ্কা সৃষ্টি হয়। **অপরদিকে পোপের একচ্ছত্র কর্তৃত্ব ও ক্ষমতা ছিল বিপদের মুখে।** তাই পাশ্চাত্যের খৃস্টানগণের দ্বন্দ্ব-কলহ এড়ানো এবং পোপের শক্তি ও ক্ষমতা বহাল রাখার জন্যে প্রয়োজন ছিল শত্রুভাবাপন্ন শক্তিসমূহকে ঐক্যবদ্ধ করে ভিন্নখাতে প্রবাহিত করা।

৫. কয়েক শতাব্দী ধরেই খৃস্টান ইউরোপ ইসলামের বিরুদ্ধে বিদ্বেষে টগবগ করছিল। সপ্তম শতকে ইসলামের আবির্ভাবের পর থেকে বিভিন্ন ভূখণ্ডে ও মানষের হৃদয়-রাজ্যে তার একের পর এক সুরভিত বিজয়াভিযানের ফলে খৃস্টান রাজশক্তি এবং ধর্মীয় শক্তি প্রতিহিংসা ও প্রতিশোধের আগুনে জ্বলে মরছিল। মুসলিম উম্মাহ খৃস্টানদের সমগ্র পূর্বসাম্রাজ্য অধিকার করে রেখেছে। যীশুর স্মৃতি বিজড়িত জেরুজালেম সহ তাদের সকল পবিত্র ভূমি বহুকাল ধরে মুসলিম-নিয়ন্ত্রণে এবং সে শক্তি একের পর এক গ্রাস করে নিচ্ছে খৃস্টান শাসিত জনপদ। ৭১৭-১৮ সালে সিরীয় মুসলিমরা জয় করে নিয়েছে রোডস দ্বীপপুঞ্জ এবং ৮ম শতকের মাঝামাঝি সময়ে সাইপ্রাসও। ৭৯৮ সালে বেলিয়ারিক দ্বীপপুঞ্জ অধিকার করে নিয়েছে স্পেনের উমাইয়াগণ। কাসকা, সার্ভিনিয়া বিজিত হয় ৮০৯ সালে এবং সিসিলি দ্বীপপুঞ্জ ৮২৭-৯০২ সালের মধ্যে। এই সিসিলি দ্বীপপুঞ্জের মাটি থেকেই মুসলিমগণ ইটালীতে আক্রমণ চালিয়ে তার শাসকদেরকে ব্যতিব্যস্ত করে তুলেছিল। বিশাল এ সাম্রাজ্যের অধিকারী মুসলিম শক্তির সামনে উন্মুক্ত তখন বাণিজ্যভিত্তিক অতুল ঐশ্বর্যের দ্বার। এমনি অবস্থায় প্রতীচ্যের রাজ্যগুলো যে হিংসার আগুনে জ্বলেপুড়ে মরবে, এ তো স্বাভাবিক। এবং তারা এর জন্যে উপযুক্ত সুযোগের অপেক্ষায় ছিল। একাদশ শতকে মুসলমানদের অলসতা ও দুর্বলতা তাদেরকে সে সুযোগ এনে দেয়।

ভৌগলিকভাবে ইউরোপ বা প্রতীচ্য তখন মুসলিম শক্তিসমূহ দ্বারা প্রায় তিন দিক থেকেই পরিবেষ্টিত হয়ে এসেছিল। ইউরোপীয় দেশ স্পেনে প্রতিষ্ঠিত রয়েছে উমাইয়া খেলাফত, ভূমধ্যসাগর থেকে আরম্ভ করে আটলান্টিক মহাসাগর হয়ে লোহিত সাগর পর্যন্ত এবং উত্তর আফ্রিকা জুড়ে আব্বাসীয় খেলাফত, আর মিশরে ফাতেমীয় খেলাফত। সুতরাং তাদের প্রতিহিংসা ও প্রতিশোধ-স্পৃহা কেমন ছিল তা সহজেই অনুমেয়। তারা এর ঝাল মেটানোর সুযোগ খুঁজছিল।

কিন্তু বিভিন্ন শক্তিশালী সালতানাতের উপস্থিতি এবং তাদের অব্যাহত অগ্রাভিযানের কারণে এদিকে চোখ তুলে তাকাবার সাহসও খৃস্টানবিশ্বের ছিল না। হামলা করা তো দূরের কথা।

৬. কিন্তু হিজরী ষষ্ঠ শতকে সেলজুকীদের পতনের পর মুসলিম জাহান দুর্বলতার চরমে পৌঁছে যায়, বরং বলা ভাল অল্প সময়ের মধ্যেই যেন জরাবার্ধক্যে আক্রান্ত হয়ে পড়ে। বিশাল বিস্তৃত মুসলিম জাহান তখন খণ্ডবিখণ্ড। 'বড় বড়' শাসক যাকে বলে 'প্রবল প্রতাপে' ছোট ছোট রাজ্য শাসন করছেন।

এমনই নাযুক মুহূর্তে ইউরোপের ধর্মোন্মাদ ক্রুসেডবাহিনী হামলা ও আগ্রাসন শুরু করে দেয়।

৭. প্রাচ্য-প্রতীচ্যের বাণিজ্য পথ ছিল তিনটি। মুসলিম শক্তির আবির্ভাবে এ তিনটি বাণিজ্য পথের নিয়ন্ত্রণই এসে গেল মুসলমানদের হাতে। আর তাতে অসুবিধায় পড়ল সমগ্র প্রতীচ্য। প্রতীচ্যের বাণিজ্য বলতে আর কিছুই রইল না। রইল শুধু মুসলমানদের কাছ থেকে মালামাল কিনে নিজেদের জনপদে পাইকারী ব্যবসা করা। তাদের ব্যবসা-বাণিজ্য পুরোপুরি মুসলিমদের দয়ার উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ল। এ কারণে মুসলিম শক্তির উপর হাড়ে হাড়ে চটা ছিল প্রতীচ্য।

৮. অন্যদিকে খৃস্টান প্রতীচ্যে ও প্রাচ্যাংশে বিভিন্ন রাজ্য-শক্তি সামন্ততন্ত্রের বেড়াজালে আবদ্ধ এবং বাইজানটাইন শক্তি পুরোপুরি বিধ্বস্ত। মুসলিম প্রাচ্য জ্ঞানে-বিজ্ঞানে ও সাংস্কৃতিক-সামাজিকভাবে অনেক অগ্রসর ও আলোকপ্রাপ্ত; ধর্মীয় দিক থেকে প্রায় কলহমুক্ত। কিন্তু খৃস্টান প্রতীচ্য জ্ঞানে-বিজ্ঞানে শুধুমাত্র অনগ্রসরই নয়, রীতিমত অন্ধকারাচ্ছান্ন; সাংস্কৃতিক-সামাজিকভাবে ও ধর্মীয় দিক থেকে বিধ্বস্ত এবং কলহযুক্ত। সামন্ত প্রথার আবর্তে পতিত কলুষিত সমাজ ব্যবস্থায় সুবিধাভোগীদের পুত্রগণ দ্বন্দ্ব-কলহে সর্বদা নিয়োজিত। আর প্রায় অশিক্ষিত খৃস্টান জন-মণ্ডলী ইসলাম অনুসারীদের সুখ ও সমৃদ্ধির কল্প-কথা শুনে ঈর্ষায় জ্বলে মরছিল।

চরম ইসলাম বিদ্বেষী লেখক হিট্টি বলতে বাধ্য হয়েছেন: "ক্রুসেডারদের সাংস্কৃতিক মান আক্রান্ত মুসলমানদের সাংস্কৃতিক মানের চেয়ে অনেক নিচু ছিল"।

৯. পশ্চিম ইউরোপের ধার্মিক খৃস্টানগণ গুনাহ মাফ এবং আত্মশুদ্ধির জন্য বায়তুল মাকদিস যিয়ারত করতে আসত। যিয়ারতকারী দল রাষ্ট্রীয় আইন-কানুনের তোয়াক্কা না করে বিনা প্রতিবন্ধকতায় পবিত্র স্থান যিয়ারত করে প্রত্যাবর্তন করত। কিন্তু সেলজুকী তুর্কীগণ ক্ষমতায় আসার পর যিয়ারতকারীগণকে রাষ্ট্রীয় নিয়ম-কানুনের প্রতি সম্মান প্রদর্শন পূর্বক অগ্রসর হতে এবং পথিপার্শ্বস্থ জনবসতিসমূহের প্রতি কোনরূপ অসৌজন্যমূলক আচরণ না করতে বাধ্য করে। এসব যৌক্তিক নিয়মকানুন যদিও তাদের বিপক্ষে ছিল না কোনভাবেই, তথাপি খৃস্টানরা -যারা এ অঞ্চলকে নিজেদের অধিকারভুক্ত বলে বিশ্বাস করত- তারা শৃঙ্খলা রক্ষার এসব আইনকে তাদের বিপক্ষে ভেবে নেয়। এর ফলে পশ্চিম ইউরোপে মুসলিমদের বিরূদ্ধে বিদ্বেষ ও শত্রুতার অগ্নি প্রজ্বলিত হয়ে ওঠে এবং পূন্যভূমি ও সেখানে পৌঁছার রাস্তাসমূহ মুক্ত করা ধর্মীয় দায়িত্বরূপে ঘোষণা দেয়া হয়। যিয়ারতকারীদের স্বশস্ত্র কাফেলা রওয়ানা হওয়ার প্রস্তুতি গ্রহণ করা হয়।

১০. এদিকে ইসলামী মধ্যপ্রাচ্যের দৃঢ়চেতা সাহসী বাদশাহ মালিক শাহ সেলজুকী ইনতিকাল করেন এবং ৪৮৯/১০৯৫ সালে শাম ও ফিলিস্তীনের লৌহমানব মালিক শাহের ভ্রাতা সুলতান তুতুশ নিহত হওয়ার পর এমন কোন শাসক আর ছিলেন না যিনি ক্রুসেড আক্রমণ প্রতিহত করার শক্তি রাখেন।

১১. এমনি পরিস্থিতিতে রোমের 'মহামান্য পোপ' এর কাছে বিরোধী পক্ষের বাইজানটাইন সম্রাট আলেকসিয়াসের নতিস্বীকারমূলক সাহায্যের প্রস্তাবের ফলে এ বিষয়ে শেষ সিদ্ধান্ত গ্রহণের কর্তৃত্ব এসে যায় পোপ দ্বিতীয় আরবানের হাতে। বায়জানটানের সম্রাটের সাহায্য প্রার্থনাকে পোপ সুবর্ণ সুযোগ মনে করলেন, সম্রাট সামান্য কিছু সৈন্য ও অস্ত্রপাতির আবেদন করেছিলেন, কিন্তু পোপ এটা ভালভাবে উপলব্ধি করেছিলেন যে, স্বীয় ক্ষমতা বহাল রাখবার প্রয়োজনে ইসলামী প্রাচ্যের উপর সর্বাত্মক আক্রমণ চালাবার এ মোক্ষম সুযোগ তাকে কাজে লাগাতে হবে। ফলে বহুকাল-প্রতীক্ষিত প্রতিশোধ গ্রহণের উপযুক্ত সিদ্ধান্তই গ্রহণ করেন 'মহামান্য পোপ'। সমগ্র খৃস্ট জগতের সর্বোচ্চ নেতৃত্ব হাতে পেয়ে তিনি ১০৯৫ খৃস্টাব্দের মার্চ থেকে অক্টোবর পর্যন্ত উত্তর-ইতালী ও দক্ষিণ ফ্রান্স সফর করে সেখানকার নেতৃবর্গকে উজ্জীবীত করার লক্ষ্যে তাদের সঙ্গে আলাপ আলোচনা করেন। অতঃপর ফ্রান্সের ক্লারমাউন্টে এক ঐতিহাসিক মহাসমাবেশে নির্মিত উচ্চ মঞ্চে দাঁড়িয়ে আবেগাপ্লুত কণ্ঠে ভাষণ দান করে উন্মাদনার ঝড় তুলেন খৃস্টজগতের একচ্ছত্র ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি মহামান্য পোপ দ্বিতীয় আরবান।

এখানে উল্লেখ্য যে. ক্রুসেড ঠিক আরম্ভ হওয়ার সময়টাতে প্রাচ্যের মুসলিম রাজশক্তি ও প্রতীচ্যের খৃস্টান রাজশক্তি উভয়ের অবস্থাই ছিল নড়বড়ে। বাগদাদ ভিত্তিক কেন্দ্রীয় খেলাফত বহু আগ থেকেই দুর্বল, আব্বাসী খেলাফতের মান-মর্যাদা তখন যথাসম্ভব বাঁচিয়ে রাখছিল সেলজুক বংশের সুলতানেরা। তার বিপরীতে স্পেনে প্রতিষ্ঠিত উমাইয়া খেলাফতের অবস্থাও তদনুরূপ। মিশরে প্রতিষ্ঠিত ফাতেমীয় খেলাফতও মোটেই সবল ছিল না, বরং তার উযীর ক্রুসেডারদের সাথে হাত মিলায়।

ওদিকে প্রতীচ্যে খৃস্টানদের কেন্দ্রীয় রাজশক্তি বলতে কোন প্রকৃত শক্তির অস্তিত্ব ছিল না। ছিল সামন্ত প্রথাভিত্তিক বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে আত্মঘাতি কলহবিবাদ। আর বাইজানটাইন সম্রাট তখন আলেকসিয়াস কমনেসাস; তিনিও সেলজুকদের ভয়ে আতঙ্কিত। এমনি অবস্থায় সম্রাট আলেকসিয়াস কর্তৃক সাম্রাজ্য রক্ষার্থে পোপের কাছে সাহায্য প্রার্থনা এবং তদনুযায়ী রোমের মহামান্য পোপ দ্বিতীয় আরবানের অগ্নিবর্ষী আবগময়ী আহ্বানে আরম্ভ হয়ে গেল ক্রুসেড! কেন্দ্রীয় রাজশক্তি নয়, কেন্দ্রীয় ধর্মীয় শক্তি হিসেবে খৃস্টান প্রতীচ্যে তখন পোপ সর্বময় ক্ষমতার আধিকারী। প্রতীচ্যে তখন একক প্রভাবশালী শক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত যাজকতন্ত্রের শীর্ষে অধিষ্ঠিত রোমের মহামান্য পোপ।

শক্তির ক্ষেত্রে প্রাচ্যের সঙ্গে প্রতীচ্যের পার্থক্যটা শুধু এই-ই ছিল যে, প্রাচ্যের মুসলিম উম্মাহর মাঝে পোপের মত কোন সর্বোচ্চ ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল না।

পোপের ভাষণের কিছু অংশঃ

ক্রুসেডকে তিনি প্রভুর ইচ্ছা বলে ঘোষণা দিয়ে বলেন:

'বাইতুল মাকদিসকে বাহানা বানাও এবং পূণ্যভূমিকে মুসলিমদের নিকট থেকে ছিনিয়ে নিয়ে তোমরা এর মালিক হয়ে যাও'।

তিনি আরো বলেন: 'এভাবেই খৃস্টান জগতে পুনঃস্থাপিত হবে শান্তি, অবসান হবে ইউরোপের ভ্রাতৃঘাতি যুদ্ধের, অবসান হবে বিধবা ও অনাথদের দুর্দশা, দূরীভূত হবে পরস্বাপহারী লোভাতুর অভিজাতদের দ্বারা চার্চ ও মঠসমূহের উপর আঘাতাক্রমণ'। বস্তুত গৃহযুদ্ধের একটা অবসান কামনা করে পোপ বিদ্যমান অবস্থাটাকে অপরিমিত চাষক্রমজাত বহুবিস্তৃত দারিদ্র ও অপুষ্টি দ্বারা ব্যাখ্যায়িত করলেন।

এসব থেকে তখনকার প্রতীচ্যের অবস্থাটাও বেশ স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

* পোপের ভাষণে উজ্জীবিত হয়ে দলে দলে লোকেরা যুদ্ধে নেমে আসে। রাজন্যবর্গ আসে কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে পদ দখল করতে, পাপীরা আসে পোপ কর্তৃক পাপমোচনের সার্টিফিকেট পেয়ে, কারাবন্দীরা আসে দণ্ড মোচন করতে, লম্পটরা আসে লুটতরাজ করতে আর সাধারণরা আসে স্বর্গ-প্রাপ্তি নিশ্চিত করতে।

প্রথমে বের হল পাদ্রী ওয়াল্টারের নেতৃত্বে একটি বাহিনী। বুলগেরীয় খৃস্টানদেরই হাতে তাদের সমাধি রচিত হয়।

তারপর সকল জাতি ও ভাষার চল্লিশ হাজার পুরুষ, নারী, বালক, বালিকার আরেকটি বাহিনী। তাদের নেতা ছিলেন সন্ন্যাসী পিটার। বুলগেরিয়ার মেলভিনে তারা পূর্ববর্তীদের হত্যার বলা নিলো। মেরে ফেলে সাত হাজার নারী-শিশু। প্রদর্শন করল সর্বপ্রকার নীচতা ও বর্বরতা। বসফরাস প্রণালী পাড়ি দিয়ে তারা যখন এশিয়ায় ধেয়ে এল, মিখদের ভাষায়- 'তাদের দুষ্কর্মে প্রকৃতিও কেঁপে উঠল। তারা মায়ের কোলের শিশু হত্যা করে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ শূন্যে ছড়িয়ে দিত'। পনেরো হাজার সৈন্য নিয়ে মুসলিম সুলতান তাদেরকে আক্রমণ করেন। তাদের পরাজিত কিছু নেতা মুসলমান হন। বাকিরা নিহত হয়।

তৃতীয় প্লাবনটি তৈরী হয়, মিখদের ভাষায়- 'মনুষ্য সমাজের অতীব মূর্খ ও বর্বর আবর্জনা দ্বারা'। এর পরিচালক ছিল গডশেল নামক এক জার্মান পাদ্রী। অবাধ পৈশাচিক লুণ্ঠন, ব্যভিচার ও লাম্পট্যে তারা সবাইকে ছাড়িয়ে যায়। অমিতাচার ও বর্বরতায় ডুবে যায়। যাত্রাপথে মৃত্যু-রক্ত আর ধ্বংসলীলার ঝড় বইয়ে দেয়। তাদেরকে আক্রমণ করে হাঙ্গেরিয় জনতা। ফলে বেলগ্রেডের সমতলভূমি ক্রুসেডারদের অস্থি ও হাড়-গোড়ে একাকার হয়ে যায়। জীবিত কয়েক হাজার ক্রুসেডার পরাজয়ের কাহিনী বর্ণনা করতে পালিয়ে যায় স্বদেশের দিকে।

পরের বাহিনী গঠিত হয় ইংল্যান্ড, ফ্রান্স, ফ্লান্ডার্স ও লরেইনের লোক দ্বারা। মিলসের ভাষায়- "ওরা ছিল বর্বর, বেপরোয়া, অসভ্য। মুসলমানদের নাগালে না পেয়ে ওরা হত্যা করে ইহুদীদের। অবাধ লুটতরাজ চালায় শহরে জনপদে। তাদের নারকীয় হত্যাযজ্ঞ হাঙ্গেরিকে বিরান করে দিচ্ছিল। হাঙ্গেরির যোদ্ধারা তাদেরকে ধ্বংস করে দেয় মেননবুর্গের রণাঙ্গনে"।

১ম ক্রুসেড:

ফ্রান্সের অধিবাসী পোপ দ্বিতীয় আরবান/উর্বান ছিলেন এর আসল আহ্বায়ক ও মূল সূচনাকারী। তিনি ১০৮৮-১০৯৯সাল পর্যন্ত পোপ ছিলেন। ৪৮৯/১০৯৬ সালে আসল ক্রুসেড শুরু হয়। ইটালি, ফ্রান্স জার্মানীর ক্রুসেডারদরে সাত লক্ষ্য সৈন্যের বিশাল এক বাহিনী গডফ্রে, বল্ডুইন, বোহেমেন্ডের নেতৃত্বে এগিয়ে চলে। তারা প্রথমে এশিয়া মাইনর দখল করে নেয়।

তারা আঁচ করতে পারে সেলজুকীদের ঐক্য ও শৃঙ্খলা আগের মত নেই। উপরন্তু কিছু বিশ্বাসঘাতক সেলজুক নেতৃবৃন্দের সাহায্য তারা পেয়ে যায়।

অতপর ১০৯৮ সালে দখল করে নেয় এডিসা(রিহা/রুহা), হলব(আলেপ্পো), এন্টিয়ক(আন্তাকিয়া)। এন্টিয়কে ক্রুসেডাররা প্রায় দশ হাজার মুসলমানকে হত্যা করে এবং অসংখ্য মানুষের উপর চালায় অকথ্য অত্যাচার ও দানবীয় নির্যাতন, যাদের অধিকাংশই ছিল অসহায় মুসলিম নারী ও শিশু।

এরপর ১০৯৯ সালে জেরুজালেমও মুসলমানদের হাতছাড়া হয়ে যায়! তাদের প্রথম লক্ষ্য তো ছিলো মুসলিম-দখল থেকে পবিত্র ভূমিগুলো উদ্ধার করা। কিন্তু একসময় তারা ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহর জন্যে চ্যালেঞ্জ এবং সিরিয়ার পার্শ্ববর্তী রাজ্যগুলো সহ ইসলামের প্রাণকেন্দ্র জাযীরাতুল আরবের জন্যে হুমকি হয়ে দাঁড়ালো। ক্রুসেডবাহিনী ঝড়-তুফানের মত সিরিয়া ও ফিলিস্তীনের দিকে ধেয়ে এলো এবং ৪৯২/১০৯৯ সালে বাইতুল মাকদিস দখল করে নিলো। যত সহজ করে বলা হল তত সহজেই ! কারণ মুসলিম জাহনের পক্ষ হতে তেমন কোন প্রতিরোধের মুখেই পড়তে হয়নি ক্রুসেডশক্তিকে। মাত্র কয়েক বছরের মধ্যে সিরিয়া ও ফিলিস্তীনের প্রায় সব শহর-জনপদ তাদের দখলে চলে গেলো, এমনকি তারা মদীনাতুর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দিকেও নাপাক দৃষ্টি দেয়ার আস্পর্ধা দেখাতে লাগল।

প্রসিদ্ধ ইংরেজ ঐতিহাসিক লেন পোল তার 'সালাদিন' গ্রন্থে লিখেছেন: 'ক্রুসেডবাহিনী দেশের গভীরে এমনভাবে ঢুকে পড়ল যেমন পচা কাঠে পেরেক ঢুকে যায়। কিছু সময়ের জন্যে এমন মনে হচ্ছিল যে, তারা ইসলাম-বৃক্ষের কাণ্ড ফালি ফালি করে ফেলবে'।

নিরাপত্তার শর্তে সন্ধি হওয়ার পরও সেখানকার অধিবাসীদের উপর কী ভয়াবহ কেয়ামত নেমে আসে তা শুনুন প্রফেসর মেয়ারের ভাষায়- 'বিজয়ের প্রমত্ততা, ধর্মীয় অন্ধ গোঁড়ামী ফেটে পড়ল ভয়ঙ্কর এক রক্তস্নানের মধ্য দিয়ে যাতে ক্রুসেডাররা ফালি ফালি করে কেটে ফেলল ধর্মবর্ণ নির্বিশেষে প্রতিটি মানুষকে যারাই দুর্ভাগ্যক্রমে এসে পড়ল তাদের তরবারির নাগালের মধ্যে। শবদেহে আবৃত রাস্তা দিয়ে পায়ের গোড়ালি সমান রক্তধারা পেরিয়ে অতিকষ্টে তারা হেঁটে যেতে লাগল। ... এ খৃস্টান বর্বরতায় গভীরভাবে স্তব্ধ ও হতবাক হয়ে গেল মুসলিম দুনিয়া। এই হত্যাকাণ্ডের স্মৃতি মিলিয়ে যেতে দীর্ঘ সময় লেগেছিল'।

আরেকজন খৃস্টান ঐতিহাসিক এভাবে তুলে ধরছেন- 'বাইতুল মাকদিসে বিজয়ী বেশে প্রবেশের পর ধর্মযোদ্ধারা এমন ব্যাপক গণহত্যা চালিয়েছিল যে, মসজিদে ওমরে যাওয়ার পথে তাদের ঘোড়া হাঁটু পর্যন্ত রক্তে ডুবে গিয়েছিল। দেয়ালে আছড়ে আছড়ে শিশুদের হত্যা করা হয়েছে, অথবা নগর-প্রাচীর থেকে চরকির মত ঘুরিয়ে ছুঁড়ে ফেলা হয়েছে'। (ব্রিটানিকা, ৯ম এডিশন,৬ষ্ঠ খণ্ড, ক্রুসেডস নিবন্ধ)

খৃস্টানগণ খুবই গর্বের সাথে দাবী করে থাকে, খৃস্টধর্ম হল প্রেম-ভালবাসার ধর্ম। যীশু শিক্ষা দিয়েছেন- 'তোমরা শুনেছ যে, প্রাচীনকালে মানুষদের এ কথা বলা হয়েছিল: চোখের বদলে চোখ, দাঁতের বদলে দাঁত, কিন্তু আমি তোমাদের বলছি: ওভাবে দুর্জনকে প্রতিরোধ করতে যেয়ো না। বরং কেউ তোমার ডান গালে চড় মারলে মুখ ঘুরিয়ে অন্য গালটিও তার দিকে পেতে দাও (মথি: ৫/৩৮,৩৯), তোমরা শত্রুকে ভালবাইস; যারা তোমাদের নির্যাতন করে তাদের মঙ্গল প্রার্থনা কর (মথি:

৫/৪৩), দয়ালু যারা, ধন্য তারা, তাদেরই দয়া করা হবে, শান্তি স্থাপন করে যারা, ধন্য তারা, তারাই ঈশ্বরের সন্তান বলে পরিচিত হবে(মথি: ৫/৩-১২)'।

কিন্তু তাদের প্রধান ধর্মগুরু মহামান্য পোপই তাদের ঈশ্বর যীশুর এ অকাট্য বিধান লংঘন করেছেন। পোপ দ্বিতীয় আরবানই ছিলেন ক্রুসেডের মূল আহ্বায়ক ও সূচনাকারী। আসলে মুখে যা-ই বলুক, আর শাস্ত্রে যা-ই থাকুক খৃস্টধর্মের পুরো ইতিহাসটাই রক্ত আর খুনে জর্জরিত। তাই তো প্রথম তিন শতকে অত্যাচারিত নিপীড়িত হওয়ার পর যখন চতুর্থ শতকে রাষ্ট্রীয় আনুকূল্য অর্জনে সফল হয় তখন এরাই আবার সাথে সাথে অন্য ধর্মাবলম্বীদের উপর অত্যাচারী ও উৎপীড়কের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। খৃস্টান ঐতিহাসিক জিন কম্বে বলেন: 'এক সময় যে বিধর্মীরা ছিল উৎপীড়নকারী, তারা এখন উৎপীড়িত হতে থাকল এবং উৎপীড়িত খৃস্টানরা উৎপীড়কের ভূমিকায় অবতীর্ণ হল'। (মণ্ডলীর ইতিহাস পরিচিতি: ৭৫ পৃ.)

'মুসলমান, ইহদী ও ভ্রান্তমতাবলম্বীদের ধরবার জন্যে আদালত একেবারে নির্দয় ছিল'। (প্রাগুক্ত: ১৯৮ পৃ.)

শুধু বিধর্মী নয় বরং তাদেরই মধ্যকার অন্যান্য দল-উপদলের (যেমন- প্রোটেস্টান্ট, অর্থডক্স সম্প্রদায় সহ যুগে যুগে সৃষ্ট বিভিন্ন দল-উপদল যাদেরকে তারা হেরেটিক বলে) মধ্যকার যুদ্ধ-বিগ্রহ ও ভয়াবহ অত্যাচারের রোমহর্ষক কাহিনীগুলি তো তাদের ইতিহাসের এক অন্ধকারতম অধ্যায়। যাতে লক্ষ লক্ষ আদম সন্তান নিহত হয়। বিরাট সংখ্যককে জীবন্ত আগুনে দগ্ধ করে পুড়িয়ে মারা হয়, যাদের সংখ্যা ২,৩০,০০০(দুই লক্ষ ত্রিশ হাজার) এর কম হবে না বলে মনে করা হয়। ফ্রান্সে একদিনেই ত্রিশ হাজার প্রোটেস্টান্ট খৃস্টানকে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়। বিস্তারিত তথ্য জানতে দেখুন– "ইযহারুল হক, ২য় খণ্ড, ৬ষ্ঠ অধ্যায়, ২য় পরিচ্ছেদ", "বাইবেল কি ঐশী গ্রন্থ, দ্বিতীয় খণ্ড, ৪র্থ অধ্যায়"।

এরপর বিজিত জেরুজালেমের খৃস্টান শাসনকর্তা রাজা বল্ডুইন একে একে দখল করে নেন জাফা, আক্রা, সিডন ও বৈরুত, ১১০১ সালে। ১১০৯ সালে দখল করে নেন ত্রিপলি (তারাবলিস)। খৃস্টানদের অধিকৃত এলাকায় নব বিন্যাসে গঠিত হয় চারটি ল্যাটিন রাষ্ট্র; এডিসা, এন্টিয়ক, ত্রিপলি ও জেরুজালেম।

প্রথম এ ক্রুসেডে বিজয়ী পক্ষ খৃস্টানেরা। তাদের এই বিজয়-গৌরব অম্লান থাকে ১১৪৪ সাল পর্যন্ত। ক্রুসেডারদের এ আক্রমণ খুব শীঘ্রই গ্রাস করে ফেলত সিরিয়া এবং মিশরকে, যদি না কুদরতে ইলাহী ইমাদুদ্দীন জঙ্গী ও তার পুত্র নূরুদ্দীন মাহমুদ জঙ্গীকে (রহ.) তাদের মোকাবেলায় দাঁড় করিয়ে না দিত।

দ্বিতীয় ক্রুসেড:

১১৪৪ সালেই ঘটনা-প্রবাহ বইতে থাকে উল্টো দিকে। এডিসা ছিল খৃস্টান রাজ্যগুলির মধ্যে সর্বাধিক মজবুত ও সুদৃঢ়। এর সামরিক গুরুত্বও ছিল অত্যাধিক। ৫৩৯ হি./১১৪৪ঈ. সালে এডিসা দখল করে নেন সেলজুক নেতা ইমাদুদ্দীন জঙ্গী। এর আগে তিনি পুনরুদ্ধার করেন বুজাআ, মসুল এবং ১১২৮ সালে আলেপ্পো, এরপর হামাহ, ১১৩৯ সালে উদ্ধার করেন লুটমারের কেন্দ্র বারীন দুর্গ।

আরম্ভ হয় ক্রুসেডের দ্বিতীয় পর্যায়। এডেসার পতন সংবাদ ইউরোপে উত্তেজনার আগুন জ্বালিয়ে দেয়। নতুন ক্রুসেড ঘোষণা করেন ক্লেয়ারভক্সের সেন্ট বার্নার্ড। এই পর্যায়ের প্রথম থেকেই মুসলমানদের জিহাদ ও প্রতিরোধকালের আরম্ভ বলা যেতে পারে। কারণ, প্রথম পর্যায়ের প্রায় ৫০ বছর উন্মুক্ত দানবীয় চরিত্রের খৃস্টান ধর্মযোদ্ধাদের কাছে পরাজিত, নির্যাতিত ও অপমানিত মুসলিম শক্তি তখন থেকে আবার জেগে উঠতে শুরু করে। এবং দৃঢ় হাতে প্রতিরোধ গড়ে তোলে নাসারাদের বিরুদ্ধে। ইমাদুদ্দীন জঙ্গীর আহ্বানে মুসলিম যোদ্ধাগণ দৃঢ় সংকল্প নিয়ে রুখে দাঁড়ায়। রুখে দাঁড়ায় ইসলামের নামে। আর খৃস্টানদের কাছ থেকে কেড়ে নেয় তারা আলেপ্পো, হারবান ও মসুল। বাগদাদের খলীফার নিকট থেকে আতাবেগ উপাধি লাভ করেন ইমাদুদ্দীন জঙ্গী।

স্রোত উল্টোদিকে বইতে আরম্ভ করেছে দেখে এক ভীষণ উত্তেজনার সৃষ্টি হয় ইউরোপে। এরই মধ্যে ১১৪৬ সালে ইমাদুদ্দীন জঙ্গীর মৃত্যু হলে আলেপ্পোর মসনদে উপবিষ্ট হন তদীয় পুত্র নূরুদ্দীন জঙ্গী। ৫৫৯/১১৬৪ সালে তিনি হারিম দুর্গ দখল করেন। আন্তাকিয়া ও ত্রিপলির বহু বিখ্যাত নাইট এতে বন্দী হয়। যুদ্ধে দশ হাজার খৃস্টান নিহত হয়। এরপরই তিনি

বানিয়াস দুর্গ জয় করেন। ওদিকে মিশরও জয় করে খৃস্টানদেরকে তিনি দু'দিক থেকে ঘেরাও করে ফেলেন। লেনপোল বলেন: 'সিরিয়ার সুলতান নূরুদ্দীন জঙ্গীর সেনাপতি (সালাহুদ্দীন) কর্তৃক নীলনদের উপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার অর্থই হল, জেরুজালেমের খৃস্টান রাজ্য ইঁদুর কলে নিপতিত হয়েছে। দু'দিক থেকেই যাদের দ্বারা সে পিষ্ট হচ্ছিল তারা ছিল একই ব্যক্তি ও একই শক্তির দু'টি বাহিনী। সালাহুদ্দীন দিময়াত ও আলেকজান্দ্রিয়া নৌ-বন্দরের উপর নিয়ন্ত্রণ লাভের মাধ্যমে একটি নৌবহরেরও নিয়ন্ত্রণ লাভ করেন। এর দ্বারাই তিনি ইউরোপের সঙ্গে মিশরের ক্রুসেডারদের যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেন'।

শুরু হয়ে যায় দ্বিতীয় ক্রুসেড !
এসময়ে পোপ ছিলেন ৩য় ইউজিন (১১৪৫-১১৫৩)।

এ ক্রুসেডের ঘোষণাদানকারী সেন্ট বার্নার্ডের আবেদনক্রমে ১১৪৭ সালে জার্মান সম্রাট তৃতীয় কনরাড ও ফ্রান্সের সম্রাট সপ্তম লুই এবং অন্যান্য সামন্ত ও নাইটদের নেতৃত্বে এক বিশাল বহিনী মুসলমানদের বিরূদ্ধে এগিয়ে আসে। এর প্রধান উদ্দেশ্য ছিল প্রাচ্যে পতনোন্মুখ খৃস্টশক্তির ভাবমূর্তি পুনরুদ্ধার করা এবং ইমাদুদ্দীন জঙ্গী যে সকল অঞ্চল অধিকার করে নিয়েছিলেন তা পুনঃদখল করা।

কিন্তু তাদের এ আক্রমণ সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হয়। নূরুদ্দীন জঙ্গীর নেতৃত্বে মুসলিম বাহিনীর হাতে পর্যুদস্ত হয়ে যায় খৃস্টান বাহিনী। এডেসা তাদের হাত থেকে আবার উদ্ধার করেন নূরুদ্দীন জঙ্গী। আর ৫৪৪/১১৪৯ সালে উভয় সম্রাটকে অপমানিত হয়ে ফিরে যেতে হয়।

তবে এ অভিযাত্রায় খৃস্টান বাহিনীর সাথে হাজার হাজার সুন্দরী ললনা অংশগ্রহণ করে। চরিত্রহীনতার চূড়ান্ত প্রদর্শনী তারা ঘটায়। ফলে এ অভিযানে মুসলমানদের বাহ্যিক কোন ক্ষতি করতে না পারলেও অবাধ যৌনাচারের যে উস্কানী তারা চারদিকে ছড়িয়ে দেয় এর ক্ষতির ভয়াবহতা ছিল গভীর ও দীর্ঘস্থায়ী।

এরপর নূরুদ্দীন জঙ্গী ১১৬২ সালে দুলুকের যুদ্ধে অর্জন করেন বিশাল জয়। ১১৬৪ সালে খস্টানদের সম্মিলিত বাহিনী সিরিয়ার হারীন শহরে আক্রমণ করে। সেখানেও তিনি তাদেরকে ধ্বংস করেন। বন্দী হয় এনিটয়কের অধিপতি বহেমণ্ড, ত্রিপলির রেমন্ড, তৃতীয় জোসেলিন, গ্রীক সেনাপতি ডিউক।

৫৬৯/১১৭৪ সালে ৫৬ বছর বয়সে কণ্ঠপ্রণালীর প্রদাহে তিনি ইনতিকাল করেন। ইংরেজ ঐতিহাসিকের ভাষায়- 'সিরিয়ার সুলতান নূরুদ্দীনের মৃত্যু সংবাদ মুসলমানদের কাছে বজ্রাঘাততুল্য মনে হয়'।

তৃতীয় ক্রুসেডঃ

১১৭৩ সালে নূরুদ্দীন জঙ্গীর মৃত্যুর পর মুসলমানদের সপক্ষে ক্রুসেডের দাঁতভাঙ্গা জবাব দেয়ার জন্যে এগিয়ে এলেন চিরস্মরণীয় যে বীর মুজাহিদ তাঁর নাম গাজী সালাহুদ্দীন আইয়ূবী রহ.। তাঁর ব্যক্তিসত্তা হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের চিরন্তন মুজেযা ও ইসলামের সত্যতার এক উজ্জ্বল সাক্ষর।

জঙ্গী বংশের মাধ্যমেই তাঁর রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় অবস্থান গ্রহণ এবং মিশরের ফাতেমী খেলাফতের অবসান ঘটিয়ে সেখানকার স্বাধীন সুলতানরূপে কর্তৃত্ব গ্রহণ। ৫৬৮/১১৭৩ নূরুদ্দীন মাহমূদ জঙ্গীর ইনতিকালের পর তিনি ইসলামী শক্তিসমূহকে ঐক্যবদ্ধ ও সুশৃঙ্খল করার জন্যে জোর প্রচেষ্টা শুরু করেন। ১১৭৫ সালে বাগদাদের খলীফা তাঁকে ফরমান দান করেন আল মাগরিব, মিশর, লিবিয়া, ফিলিস্তীন, পশ্চিম আফ্রিকা ও মধ্য এশিয়ার অধিপতিরূপে। ফলে প্রাচ্যের মুসলিম শক্তির প্রধানতম পুরুষ হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করেন সুলতান সালাহুদ্দীর আইয়ূবী। ইতিহাসে তিনিই অমর গাজী সালাহুদ্দীন আইয়ূবী নামে চির পরিচিত।

ক্রুসেডারদের ধর্মযুদ্ধের দানবীয় স্পৃহাকে ধ্বংস করে দেয়াই ছিল সুলতানের শ্রেষ্ঠ অবদান।

তৃতীয় ক্রুসেড সংঘটিত হয় সুলতান সালাহুদ্দীন আইয়ুবীর গৌরবময় বিজয়সমূহেরই (১১৬৯-১১৯৩) প্রতিক্রিয়াস্বরূপ।

১৪ই রবীউল আখীর ৫৮৩ হি. মোতাবেক ৪ঠা জুলাই ১১৮৭ ঈ. সালে হিত্তিনের ভাগ্যনির্ধারণী যুদ্ধে তিনি খৃস্টান বাহিনীকে এমনভাবে পর্যুদস্ত করেন যে, তাদের কোমর ভেঙ্গে যায় এবং ভাগ্যবিপর্যয় অবধারিত হয়ে পড়ে। লেনপোল রণাঙ্গনের চিত্র এভাবে এঁকেছেন- 'খৃস্টান সেনাবাহিনীর নির্বাচিত ও বাছাইকৃত জওয়ানেরা বন্দী হয়। জেরুজালেমের রাজা গাঈ, তার ভাই রেজিনাল্ড, তেনিনের হামফ্রে, তাবাকাত দাবিয়া ও ইসবেতারের প্রধানদ্বয় এবং বড় বড় খৃস্টান নাইটকে গ্রেফতার করা হয়। খৃস্টান বাহিনীর অশ্বারোহী ও সাধারণ পদাতিক সৈন্য যারা জীবিত ছিল সকলেই মুসলমানদের হাতে বন্দী হয়ে গিয়েছিলো। একেকজন মুসলিম সৈনিক ত্রিশ বত্রিশজন বন্দীকে রশি-বেঁধে নিয়ে যাচ্ছে। ভাঙ্গা ক্রুশ ও কর্তিত অঙ্গ ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিলো। ধড়গুলো এমন স্তূপ হয়ে ছিলো, যেন থরে থরে রাখা বৃক্ষকাণ্ড। ছিন্ন মস্কগুলো যেন ক্ষেতে সাজানো তরমুজ। ত্রিশ হাজার সৈন্য নিহত হয়েছিল'।

সে যুদ্ধেই বন্দী হয় জেরুজালেমের রাজা গাঈ দা লুসিনান এবং মক্কা মদীনাকে ধ্বংস করার অভিলাষী খৃস্টান নেতা রেজিনাল্ড। লুণ্ঠন বৃত্তির অপরাধে এবং সন্ধিচুক্তি অবমাননার দায়ে এই মহাধূর্ত রেজিনাল্ডকে দেয়া হয় মৃত্যুদণ্ড। কিন্তু সসম্মানে মুক্তি দেয়া হয় রাজা গী দা লুসিনানকে। এভাবে ৫৮২/১১৮৬ সালের পর থেকে নিয়ে তিনি সিরিয়া ও ফিলিস্তীনের রাজ্যসমূহ এক এক করে উদ্ধার করেন।

এবং এর পরপরই ২৭শে রজব ৫৮৩ হি. (১১৮৭ ঈ.) সালে সপ্তাহব্যাপী সফল অবরোধের পর দ্বিতীয়বার আযাদ করে নেন প্রায় নয় দশক ধরে হারানো জেরুজালেম ও পবিত্র বাইতুল মাকদিস। গাজীরূপে অভিহিত হন সুলতান সালাহুদ্দীন আইয়ূবী রহ.। সুলতানের আস্থাভাজন সহচর কাজী বাহাউদ্দীন শাদ্দাদ লিখেন- 'চারদিকে শোনা যাচ্ছে শুধু তাকবীর ও দুআ'র গুঞ্জন। নব্বই বছর পর বাইতুল মাকদিসে জুমার নামায হল। সাখরা গম্বুজের উপর যে ক্রুশ স্থাপন করা হয়েছিল তা নামিয়ে ফেলা হল। চোখের সামনে অভাবিতপূর্ব সব দৃশ্য। আল্লাহর সাহায্য এবং ইসলামের বিজয় সবাই স্বচক্ষে দেখতে পাচ্ছে'। (তারীখে আবিল ফিদা আল হামাবী)

আজ আবার আরেকজন সালাহুদ্দীনের জন্যে গভীরভাবে প্রহর গুনছে মুসলিম উম্মাহ।

জেরুজালেম সহ প্রায় সকল অঞ্চলই তিনি পুনরুদ্ধার করতে সক্ষম হন। খৃস্টানদের নিকট কেবল এন্টিয়ক, তারাবলুস, সূর এর উপকূলবর্তী অঞ্চলগুলি ছাড়া আর কিছুই অবশিষ্ট থাকেনি।

জেরুযালেমের পতনে খৃস্টান ইউরোপে ক্ষোভ ও বিদ্বেষের এক তরঙ্গ বয়ে যায়। এরই প্রতিক্রিয়া স্বরূপ খৃস্টান প্রতীচ্যে আরম্ভ হয় তৃতীয় ক্রুসেডের প্রস্তুতি। সমগ্র খৃস্টজগত একজোট হয়ে সিরিয়ার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল।

এ সময়ে পোপ ছিলেন ৩য় ক্লেমেন্ট(১১৮৭-১১৯১) এবং ৩য় সেলেস্টিন(১১৯১-১১৯৮)।

ইংল্যান্ডের রাজা সিংহ-হৃদয় রিচার্ড, জার্মানির রাজা ফ্রেডারিক বারবারসা, ফ্রান্সের রাজা ফিলিপ অগাস্টাসের নেতৃত্বে এগিয়ে আসে এক বিশাল খৃস্টান বাহিনী। জার্মান নৃপতি তো এশিয়া মাইনরের একটি নদীতে ডুবে মৃত্যুবরণ করেন, অগাস্টাস ক্রুসেডারদেরকে টায়ারে একত্রিত করে আক্রার দিকে অগ্রসর হন, কিন্তু রিচার্ডের সাথে মতবিরোধের ফলে দুই বছর তা অবরোধ করে রাখবার পর স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন।

খৃস্টানদের পক্ষে জেরুজালেম সহ অন্যান্য বিজিত শহর ও দুর্গ দখল করা সম্ভবপর হয়নি। কারণ তিনি তো গাজী সালাহুদ্দীন, পাহাড়ের মত অটল অবিচল ! লেনপোল সঠিক মন্তব্যই করেছেন- 'তৃতীয় ক্রুসেডযুদ্ধে সম্মিলিত খৃস্টানশক্তি মোকাবেলায় নেমেছিল। কিন্তু তারা সালাহুদ্দীনের শক্তি ও মনোবলে সামান্যতম চির ধরাতে পারেনি এবং পারেনি তার বাহিনীতে কোন ফাটল সৃষ্টি করতে'।

১১৮৯ সালে ক্রুসেডাররা আক্রা অবরোধ করে দখল করে নেয়। সুলতান তাদেরকে পাল্টা আক্রমণ করে পুনরায় অধিকার করেন ১১৯০ সালে। কিন্তু কিছুদিন পর ইউরোপের সম্মিলিত শক্তি শহরটির উপর আবার আঘাত হানে। দু'বছর যুদ্ধ চলতে থাকে। আক্রায় অবরুদ্ধ যোদ্ধারা বাইরে থেকে কোন সাহায্য পাচ্ছিল না। ফলে ভীষণ দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। তাই বাধ্য হয়ে নিরাপত্তা ও দুই লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা দেয়ার শর্তে তারা আত্মসমর্পন করে। কিন্তু মুদ্রা দিতে কিছুটা দেরি হওয়ায় ইংল্যান্ডের 'সিংহ হৃদয়' রিচার্ড নির্দয়ভাবে হত্যা করেন অধিবাসীদেরকে। ষাট হাজার মানুষকে খুন করেন ঠাণ্ডা মাথায়। ক্রুসেডাররা এরপর

ভোগের আনন্দে গা ভাসায়। মিখদের ভাসায়- 'শান্তির স্বাদ, খাদ্যদ্রব্যের প্রাচুর্য, সাইপ্রাসের মদ আর কাছের দ্বীপপুঞ্জ থেকে ধরে আনা নারীদের নিয়ে তারা অভিযানের উদ্দেশ্য ভুলে যায়'।

সুলতানের সাথে আরো এগারটি যুদ্ধ হয়। অবশেষে দীর্ঘ পাঁচ বছর লাগাতার যুদ্ধের পর ক্লান্ত-শ্রান্ত ও বিধ্বস্ত হয়ে রিচার্ড ১১৯২ সালের ২ সেপ্টেম্বরে সুলতানের সাথে একটি সন্ধিচুক্তি করতে সফলকাম হন। যা ইতিহাসে 'রামলার সন্ধি' নামে খ্যাত। এরপর তিনিও স্বদেশে ফিরে যান। সন্ধির শর্তানুযায়ী শুধুমাত্র আক্কা থেকে য়াফা পর্যন্ত উপকূলীয় শহরগুলি খৃস্টানদেরকে প্রদান করা হয় এবং তারা বাইতুল মাকদিস যিয়ারতের স্বাধীনতা লাভ করে।

এখানে উল্লেখ্য যে, খৃস্টান বাহিনী প্রতিটি বিজয়ের পর যে গণহত্যা চালিয়েছিল মুসলিম বাহিনীর বিজয়ে কোথাও তার প্রতিশোধ গ্রহণ করা হয়নি। লেনপোল লিখতে বাধ্য হয়েছেন- 'মানুষ যদি সালাহুদ্দীনের অন্যান্য কীর্তির মধ্যে শুধু এই একটি কীর্তির কথা সঠিকভাবে জানতে পারত যে, কিভাবে তিনি জেরুযালেম পুনরুদ্ধার করেন তাহলে এটাই যথেষ্ট ছিলো একথা প্রমাণ করার জন্যে যে, তিনি শুধু তাঁর যুগের নন, বরং সর্বকালের শ্রেষ্ঠ মহানুভব ব্যক্তি ছিলেন। আভিজাত্যে ও মহত্ত্বে সত্যি তিনি অনন্য ও অতুলনীয় ছিলেন'।

তিনি আরো লেখেন- '..এভাবেই সুলতান সালাহুদ্দীন পরাজিত ও বিজিত শত্রুদের প্রতি ঐকান্তিক উদারতা ও বদান্যতা প্রদর্শন করেন। সলতানের এই উদারতার বিপরীতে তাঁর এই শত্রুদের পশুসুলভ বর্বর আচরণের কথাও মনে পড়ে। ক্রুসেডারগণ ১০৯৯ সালে জেরুজালেম বিজয়ের পর গডফ্রে ট্যাংকার্ড যখন সেখানকার গলি-ঘুপচিগুলো অতিক্রম করছিল তখন মুসলমানদের উপর তারা কী জুলুমই না করেছিল ! চতুর্দিকে শত শত লাশ পড়ে ছিল এবং আহতদের কাতর আর্তনাদে ভারাক্রান্ত হয়ে উঠেছিল আকাশ-বাতাস। এমতাবস্থায়ই ক্রুসেডাররা ঐসব নিরপরাধ অসহায় মুসলমানদেরকে ভীষণ যন্ত্রণা দিয়ে হত্যা করেছিল এবং জীবিত লোকদেরকে পুড়ে মেরেছিল। কুদস এর ছাদে ও বুরুজে যে সব মুসলমান আশ্রয় নিয়েছিল ক্রুসেডাররা তাদের সেখানেই তীরের আঘাতে এফোঁড় ওফোঁড় করে নীচে নিক্ষেপ করেছিল'।

তিনি আরো বলেন: 'এই পাশবিক হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়েছিল ঠিক সে জায়গায় যেখানে ঈসা মসীহ একদা দাঁড়িয়ে দয়া-মায়া ও প্রেমের ওয়াজ শুনিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন: "তারাই কল্যাণ ও প্রাচুর্যের অধিকারী এবং তাদের উপরই আল্লাহর রহমত নাযিল হয় যারা দয়া প্রদর্শন করে"। খৃস্টানরা এই পাক-পবিত্র শহরে মুসলমানদের রক্তে হোলি খেলবার সময় একদম ভুলে গিয়েছিল তাদের রাসূলের ঐ পবিত্র বাণী (বাস্তবে খৃস্টধর্মের পুরো ইতিহাস পড়ে দেখলে এমনই দেখা যাবে)। এসব নির্দয় ও নির্মম খৃস্টানদের পরম সৌভাগ্যই বলতে হবে যে, তারা পরাজিত হয়ে সুলতান সালাহুদ্দীনের মত উদার হৃদয় সেনাপতির হাতে পড়েছিল যিনি অত্যন্ত সহৃদয়তার সাথে তাদের ভাগ্যের ফয়সালা করেছিলেন' (আর বাস্তবে ইসলামের পুরো ইতিহাস পড়ে দেখলে এমনই দেখা যাবে) ।

এভাবে সমাপ্ত হয় ক্রুসেডের দ্বিতীয় পর্যায়, এ পর্যায়ে বিজয়ী পক্ষ ছিল মুসলমানগণ।

১১৯৩-১২৯১ সাল পর্যন্ত ব্যাপ্ত ক্রুসেডের যে তৃতীয় পর্যায়, তাতে জয়-পরাজয় দু'পক্ষেরই ভাগ্যে জোটে। তবে এ পর্যায়ে ক্রুসেডের তীব্রতা কমে যায়।

চতুর্থ ক্রুসেড:

৫৮৯/১১৯৩ সালে গাজী সালাহুদ্দীন রহ. এর ইনতিকালের পর ৫৯১/১১৯৫ সালে রোমের পোপ ৩য় সেলেস্টিন (১১৯১-১১৯৮)এর আহ্বানে চতুর্থ ক্রুসেড আরম্ভ হয়।

জার্মানের রাজা ৬ষ্ঠ হেনরির নেতৃত্বে ক্রুসেডাররা এগিয়ে আসে। তারা সিসিলি দখল করে সিরিয়ার দিকে অগ্রসর হলে সালাহুদ্দীনের পুত্র আদিল তাদের গতিরোধ করেন। অপরদিকে আক্রা পোঁছার পর রাজা হেনরি মৃত্যুবরণ করেন। এ আক্রমণ ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। ১১৯৮ খৃস্টাব্দে তারা একটি সন্ধিচুক্তি করে ফিরে যেতে বাধ্য হয়।

পঞ্চম ক্রুসেড:

তিন বছর পরই পোপ তৃতীয় ইন্নোসেন্ট(১১৯৮-১২১৬) মুসলমানদের বিরুদ্ধে পঞ্চম ক্রুসেড ঘোষণা করে। তাতে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন ইংল্যান্ডের রাজা রিচার্ড ব্যতিত ইউরোপের অন্যান্য রাজপরিবারের সদস্যগণ। কিন্তু সিরিয়া থেকে যায় মুসলমানদের অধিকারেই।

এ ক্রুসেডের একটি মৌলিক উদ্দেশ্য ছিল- বাইজানটাইন সাম্রজ্যের রাজধানী কনস্টান্টিনোপল দখল করে গ্রীক চার্চকেও নিজেদের অধিকারভুক্ত করে প্রাচ্যের খৃস্টানদের উপরেও প্রভাব-প্রতিপত্তি প্রতিষ্ঠা করা।

তাই ১২০২ সালে ক্রুসেডাররা তাদের জ্ঞাতি ভাই অর্থডক্সীদের উপর কনস্টান্টিনোপলে হামলা করে বসে। জ্বালিয়ে দেয় নগরীর এক চতুর্থাংশ, খৃস্টান-নগরীটিকে তারা ভস্ম করতে থাকে আট দিন ধরে। অত্যাচার ও লুণ্ঠনের শোচনীয় দৃশ্যের অবতারণা করে। ১০৯৯ সালে বাইতুল মাকদিসের গণহত্যার চেয়ে তা কোন অংশে কম ছিল না। অবশেষে তারা বায়জানটাইন সাম্রাজ্যকে জয় করে দুই অংশে বিভক্ত করে ফেলে।

অতপর ১৪৫৩ সালে সুলতান মুহাম্মাদ আলফাতিহ সেটাকে জয় করে একেবারে বিলুপ্ত করে দেন।

এই তৃতীয় ইন্নোসেন্টই ফ্রান্সের তথাকথিত ধর্মচ্যুত খৃস্টানদের বিরুদ্ধেও একটি ধর্মযুদ্ধ পরিচালনা করেন। যা ‘আলবিজেনসিয়ান ক্রুসেড’ নামে পরিচিত।

ষষ্ঠ ক্রুসেড:

১২১৬ খৃস্টাব্দে আবারো রোমের পোপ তৃতীয় ইন্নোসেন্ট(১১৯৮-১২১৬) ও কন্সটান্টিনোপলের প্যাট্রিয়াক সম্মিলিতভাবে সূচনা করেন যে ষষ্ঠ ক্রুসেড, তাতে হাঙ্গেরি, অস্ট্রিয়া, আর্মেনিয়া, সাইপ্রাসের দুই লক্ষাধিক ক্রুসেডার সিরিয়ার পথে অগ্রসর হয়। সেই সূত্রে তারা মিশর ও ডালমেটিয়া গমন করে। দিময়াতে প্রায় ৭০,০০০ মানব সন্তানকে নৃশংসভাবে হত্যা করে।

এরপরেও তারা পরাজিত ও বিপর্যস্ত হয়। এ যুদ্ধে যেহেতু জার্মানী ও ফ্রান্সের অল্পবয়স্ক বালক অংশগ্রহণ করে তাই একে বালকদের আক্রমণও বলা হয়। এই যুদ্ধ চলাকালে ৬১৮/১২২১ সালে মিশরের প্রসিদ্ধ শহর দিময়াতে ক্রুসেডারগণ প্রচণ্ড মার খেয়ে শোচনীয়ভাবে পরাজয় বরণ করে এবং অবশেষে আলমালিকুল আদিলের পুত্রের সাথে সন্ধিচুক্তি করে তাদেরকে ফিরে যেতে হয়।

সপ্তম ক্রুসেড:

পোপ ৯ম গ্রেগরির (১২২৭-১২৪১) প্ররোচনায় সম্মিলিত ইউরোপীয় খৃস্টানগণের সপ্তম আক্রমণ শুরু ৬২৬/১২২৮ সালে জার্মানের সম্রাট দ্বিতীয় ফ্রেডারিক এর নেতৃত্বে। এর ফলে আলমালিকুল কামিলের সাথে ক্রুসেডারদের নতুন সন্ধিচুক্তি সম্পাদিত হয়, এবং বাইতুল মাকদিস পুনরায় আরেকবার ক্রুসেডারদের হাতে চলে যায়। ১২৪৪ সাল পর্যন্ত তাদের দখলেই থাকে।

অষ্টম ক্রুসেড:

এ সময়ে পোপ ছিলেন ৪র্থ ইন্নোসেন্ট (১২৪৩-১২৫৪)।

১২৪৫ সালে ফ্রান্সের রাজা নবম লুইস এ ক্রুসেড শুরু করেন। দিময়াত দখল করে মসজিদগুলোকে গীর্জা বানান। সব ধরণের বর্বরতার দরজা খুলে দেয়া হয়। ব্যারনরা ভোগের প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হয়। সাধারণরা মগ্ন হয় জঘন্য পাপকর্মে।

আল কামিলের পৌত্র আসসালিহ খাওয়ারিজমের তুর্কীদের সাহায্যে ৬৪২/১২৪৪ সালের অষ্টম ক্রুসেডে খৃস্টানদের হাত থেকে পুনরুদ্ধার করেন জেরুজালেম/ আলমালিকুল কামিলের ভাই আলমুআজ্জাম বাইতুল মাকদিস হতে ক্রুসেডারদেরকে বহিষ্কার করে দেন।

অতপর রোমের পোপের আহ্বানে ফ্রান্সের রাজা নবম লুই ক্রুসেডারদের নেতৃত্বভার গ্রহণ করেন। এটাকে ক্রুসেডারদের শেষ বিরাট আক্রমণ বলে গণ্য করা হয়। এ আক্রমণ উত্তর আফ্রিকার তিউনিসে নিষ্ফল অবরোধের পর খতম হয়ে যায়। এর কারণ ছিল- ক্রুসেডারদের মাঝে এক ভয়ংকর মহামারি ছড়িয়ে পড়ে, যাতে আক্রান্ত হয়ে স্বয়ং নবম লুইও বেঘোরে প্রাণ হারায়।

তবে এ সেনাদলের একটি অংশ ইংল্যান্ডের যুবরাজ এডওয়ার্ডের নেতৃত্বে ৬৭০/**১২৭১** সালে আক্রা পৌঁছে। এডওয়ার্ড পারস্যের মোঙ্গল রাজাকে মিশর ও সিরিয়ার মামলূক তুর্কীদের উপর হামলা করার আহ্বান জানিয়ে ব্যর্থ হন। অবশেষে তিনি যাহির বারবারোসের সাথে সন্ধিচুক্তি করার সিদ্ধান্ত নেন। ফলে এবছরেই কায়সারিয়ার ঐতিহাসিক চুক্তি সম্পাদিত হয়।

মামলুক তুর্কী সুলতান যাহির বারবারোস **১২৬১-১২৭১** খৃ. পর্যন্ত দশ বছরকাল একাধারে ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে জিহাদ জারী রাখেন।

নবম ক্রুসেড:

এ সময়ে পোপ ছিলেন ৪র্থ নিকোলাস (১২৮৮-১২৯২)।

অবশেষে নবম ও শেষ ক্রুসেডে **১২৯১** সালের মধ্যেই মিশরের মামলুক সুলতান আশরাফ খলীলের নেতৃত্বে মুসলিম বাহিনী আক্রাসহ খৃস্টান অধিকৃত সকল রাজ্যই দখল করে নেন।

এভাবে আপাত সমাপ্ত হয় খৃস্টানদের পরিচালিত ক্রুসেড।

ক্রুসেড যুদ্ধের সময় সার্বিকভাবে মুসলিম বিশ্ব পতনোন্মুখ এবং পারস্পরিক বিবাদ ও অনৈক্যের শিকার ছিল। এইজন্যেই সিরিয়া,ফিলিস্তীন ও মিশর (যেখানে এযুদ্ধগলো সংঘটিত হয়) ছাড়া বাহিরের মুসলিম জগতে এই বিরাট ঐতিহাসিক যুদ্ধের প্রভাব খুব কমই অনুভূত হয়।

এটা ইতিহাসের অলৌকিক ঘটনার মধ্যে গণ্য করা হয় এবং ঐতিহাসিকগণ আজও আশ্চর্য হয়ে যান যে, সম্মিলিত ইউরোপের ক্রুসেডারদের সম্মুখে মিশর ও সিরিয়ার মত দুইটি ক্ষুদ্র রাষ্ট্র কিভাবে প্রতিরোধ গড়ে তোলে ?! উপরন্তু তারা ইমামুদ্দীন জঙ্গী, নূরুদ্দীন জঙ্গী, সালাহুদ্দীন আইয়ুবী, আলমালিকুল আদিল, জাহির বারবারোস ও সাইফুদ্দীন কালাউনের মত এমন দৃঢ়চেতা ও সাহসী নেতা কিভাবে সৃষ্টি করে, যাদের মাহাত্ম ও ইস্পাত কঠিন ব্যক্তিত্বের কথা ক্রুসেডারগণও স্বীকার করতে বাধ্য হয়।

উল্লেখ্য যে, এই সপ্তম হি./ত্রয়োদশ খৃ. শতকে ক্রুশ ও হিলালের যুদ্ধ যখন তুঙ্গে তখন এশিয়ায় একটি নবতর প্রচণ্ড শক্তির উত্থান ঘটে। যা দেখে পোপ ও ইউরোপের রাজাদের মধ্যে বিরাট আশার সঞ্চার হয়। আর সে নব্য শক্তিটি ছিল চেঙ্গীয খানের প্রতিষ্ঠিত মোঙ্গল রাজত্ব। পোপ মোঙ্গল সম্রাটকে খৃস্টান বানাবার উদ্দেশ্যে মিশনারীদের একটি দল প্রেরণ করেন এবং ইউরোপের সম্রাটদের দ্বারা দূতের মাধ্যমে বহু উপঢৌকন প্রেরণ করে তাদের সহযোগিতা কামনা করে এবং মুসলমানদের বিরুদ্ধে তাদেরকে উস্কে দেবার জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা করে। কিন্তু এতে তেমন ফলোদয় হয়নি। মোঙ্গলগণ ৬৫৬/১২৫৮ সালে বাগদাদের আব্বাসী খেলাফতের বিলোপ সাধন করলেও সিরিয়া ও মিশর সম্পর্কে তাদের আশা পূর্ণ হয়নি। তদুপরি মোঙ্গলগণ খৃস্টান ক্রুসেডারদের সহযোগী হয়ে বাইতুল মাকদিস ও মিশর হতে মসলমানগণকে বহিষ্কার করতে পারেনি। বরং মামলূক তূর্কীগণ কেবল মোঙ্গলদের আক্রমণ প্রতিহতই করেনি, সিরিয়ায় তাদেরকে উপর্যুপরি এমন শোচনীয়ভাবে পরাস্ত করতে থাকে যার ফলে মোঙ্গলদের সামরিক শক্তির কোমর ভেঙ্গে যায়।

শেষ পর্যন্ত অন্য শক্তির সাহায্যে মুসলিম শক্তিকে ধ্বংস করার আশা আর থাকল না খৃস্টানদের। থাকল শুধু মুসলমানদের বিরুদ্ধে তাদের যুগ-যুগান্তরের পুঞ্জীভূত আক্রোশ।

ক্রুসেড-পরবর্তী অবস্থা:

খৃস্টানদের দখলীকৃত জনপদসমূহ পুনরুদ্ধার করে যুদ্ধংদেহী মামলুক বীরবৃন্দ এরপর হানা দেন পার্শ্ববর্তী এশীয় ও লেভান্টীয় খৃস্টান অধিকৃত রাজ্যসমূহে এবং তা দখলও করে নেন। ১৩৬৫ সালের পর থেকে মিশরীয় মামলুক সুলতানগণ গড়ে তুলতে আরম্ভ করেন এক শক্তিশালী নৌবাহিনী। খৃস্টানগণ তখন দীর্ঘ সময় ধরে আত্মরক্ষামূলক ব্যবস্থায় ব্যস্ত হয়ে পড়ে।

এর কিছুকাল পর ঝিমিয়ে পড়া মিশরীয় শক্তির স্থান দখল করে কাউন্টার ক্রুসেড বা জিহাদের পথে দৃঢ় পায়ে এগিয়ে আসে নবোত্থিত উসমানী (তারা বিকৃত করে বলে 'অটোম্যান') তুর্কী শক্তি। বাইজানটাইন শক্তির শেষ দুর্গ ধ্বসে পড়ে তুর্কীদের প্রবল হুংকারে। ১৪৫৩ সালের ২৯শে মে তুর্কীরা দখল করে নেয় হাজার বছরের গর্ব ও দম্ভের প্রতীক বাইজানটাইন-রাজধানী কনস্টান্টিনোপল। দুর্নিবার এক নৌশক্তিরূপে গড়ে উঠেছে তখন তুর্কীদের দুরন্ত বাহিনী। ইউরোপের এক অংশবিশেষ, তাদের শক্তি হয়ে উঠেছে ইউরোপীয় খৃস্টানদের জন্য এক ত্রাসের কারণ। সুলতান সুলায়মান তখন প্রতীচ্যের সামুদ্রিক ও রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডেও মাথা গলাতে আরম্ভ করেছেন। শুধু প্রচ্যের নয়, প্রতীচ্যেরও অন্যতম শক্তি তখন তুরস্ক। উসমানীগণ ভূমধ্যসাগরকে ক্রুসেডারদের থেকে কেবল পরিষ্কারই করলেন না, বরং ইউরোপের প্রাণকেন্দ্র পর্যন্ত তাদেরকে ধাওয়া করে নিয়ে গেলেন এবং এমন শোচনীয়ভাবে পরাস্ত করেন যে, পরবর্তী দুই শতাব্দী পর্যন্ত ক্রুসেড ইউরোপের রাজনৈতিক ও সামরিক ময়দানে অগ্রসর হওয়ার হিম্মত পায়নি।

আর এই মামলূক সুলতানগণই পূণ্যভূমি হতে ক্রুসেডারদের শেষ চিহ্নটুকুও মুছে ফেলেন।

উল্লেখ্য যে, ৬৯০/১২৯১ সালে সিরিয়া ও পূণ্যভূমি হতে ল্যাটিনী আক্রমণকারীদেরকে বহিষ্কার করে দেয়া হলেও ভূমধ্যসাগরের অধিকাংশ দ্বীপ যথা মালটা, রোডস, সাইপ্রাস খৃস্টান অধিকারভুক্ত হয়ে যায়। এখান থেকেই তারা মধ্যযুগের শেষ পর্যন্ত ক্রুশের নামে ইসলামী মধ্যপ্রাচ্যে লুটতরাজ ও দস্যুগিরি করতে থাকে। এখানেই 'নাইট টেম্পলার' জাতীয় 'পবিত্র দল' সৃষ্টি হয়, যা প্রকৃতপক্ষে ছিল নৌদসুস্যদের সুসংগঠিত দল। কিন্তু প্রবিত্রতার সাথে সম্পর্কিত করে খৃস্টজগতে তাকে সম্মানিত করে তোলা হয়েছে।

ক্রুসেডের ফলাফল:

ক্রুসেড তো চলল বহুদিন ধরে; বহুদিন ধরে চলল কাউন্টার ক্রুসেড বা জিহাদ। নানা চড়াই উৎরাইর মধ্য দিয়ে শেষ পর্যন্ত বিজয়ী হল প্রাচ্যের মুসলিম শক্তিই।

তবে এসব ক্রুসেড ও কাউন্টারক্রুসেডের ফলাফল ছিল বিভিন্নমুখী এবং ফলাফলের বিচারে দেখা যায় যে পরিণামে অযোগ্যতা-পীড়িত শেষ বিজয়ীদের চাইতে বিজিতদের লাভই হয়েছে বেশি।

* হিট্টি বলেন: 'প্রাচ্য অপেক্ষা প্রতীচ্যের জন্যে ক্রুসেড ছিল অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ। খৃস্টানদের ধর্মযুদ্ধের ফলে প্রাচ্য-প্রতীচ্যের মধ্যে যে সম্পর্কের সৃষ্টি হয় তার অবশ্যম্ভাবী ফল ছিল কুসংস্কারাচ্ছন্ন ইউরোপে মুসলিম সভ্যতার অনেক উপকরণের অনুপ্রবেশ। প্রাচ্যের চেয়ে পাশ্চাত্য জগতই এই ক্রুসেড থেকে বেশি উপকৃত হয়েছে'।

ধর্মযুদ্ধ যদিও একদিকে প্রাচ্য ও পাশ্চত্যের মধ্যে অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সম্পর্ক(পাশ্চাত্যের সমৃদ্ধি) বৃদ্ধি করেছে অন্যদিকে ধর্মীয় ক্ষেত্রে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মধ্যে ব্যাপক ব্যবধান সৃষ্টি করেছে (খৃস্টমণ্ডলীর ইতিহাসে নারী- ১৮৮ পৃ.)

রবার্ট ব্রিফল্ট তার 'দি ম্যাকিং অব হিউম্যানিটি' গ্রন্থে লেখেন- 'ইউরোপীয় সংস্কৃতি ও সভ্যতার বিকাশের এমন কোন স্তর নেই যাতে আরবদের প্রভাব অনুপস্থিত'।

* চতুর্দশ শতাব্দীর আগ পর্যন্ত তাদের প্রতিভার খাতাটি ছিল একেবারেই সাদা।

আর কবি ল্যাঙ্গল্যান্ড ১৩০০-১৪০০, তার সমসাময়িক মহাকবি চসার ১৩৪০-১৪০০, মহাকবি উইলিয়াম শেক্সপিয়ার ১৫৬৪-১৬১৬, কবি মিল্টন ১৬০৮-১৬৭৪, কবি ওয়ার্ডস ওয়ার্থ ১৭৭০-১৮৫০, কবি শেলি ১৭৯২-.., লর্ড বায়রন ১৭৮৮-.., লেখক দার্শনিক টমাস ম্যুর ১৪৭৮-.., কার্লাইল ১৭৯৫-..., ঐতিহাসিক গীবন ১৭৩৭-.., ঐতিহাসিক ম্যাকলে ১৮০০-..

এঁরা সবাই ত্রয়োদশ শতাব্দীর পরের। বিশ্ব সভ্যতায় এঁদের প্রত্যেকেই শক্তিশালী ভূমিকা রেখেছেন। গোটা দুনিয়া তাঁদেরকে এক নামে চেনে।

দেখার বিষয় হল- এই সব প্রতিভার উন্মেষ চতুর্দশ শতাব্দীর আগে নয়। পরের। ক্রুসেডের পরে।

* ঐতিহাসিক টয়েনবী বলেন: ‘ক্রুসেডের ফলেই আধুনিক ইউরোপ জন্ম লাভ করেছে’।

নিউপোল্ড উইস তার ‘ইসলাম এট দা ক্রসরোড’ গ্রন্থে লেখেন- ‘নিশ্চয় রেনেসাঁ বা বিজ্ঞান এবং ইউরোপীয় শিল্পের পুনর্জাগরণ ইসলাম ও আরব উৎসের কাছে ঋণী। এটি পশ্চিমা ও পূর্বের মাঝে একটি বস্তুগত সংযোগ তৈরী করেছিল। বাস্তবিকই ইউরোপ ইসলামী বিশ্বের কাছে ব্যাপক ভাবে উপকৃত হয়েছিল। কিন্তু তারা কখনো এই উপকারের কথা স্মরণ রাখেনি। কিংবা স্বীকৃতিও দেয়নি। তারা ইসলামের প্রতি বিদ্বেষের মাত্রা কমিয়ে কোনরূপ কৃতজ্ঞতাও দেখায়নি। বস্তুত দিন দিন তাদের এই ঘৃণার মাত্রা আরো গভীর ও তীব্র হয়েছে। এবং একসময় তা নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে গেছে। তাদের মধ্যে এই ঘৃণা জনপ্রিয়তা পেয়েছে’।

* রোমান ক্যাথলিক সম্প্রদায়ের ধর্মগুরু পোপের নির্দেশে সংঘটিত ক্রুসেড শেষ পর্যন্ত যাজক শ্রেণীর কলঙ্কময় অধ্যায়ে পরিণত হয়। মানুষেল জ্ঞানোন্মোশের আলোতেই যাজক শ্রেণীর পরিচয় অধিকতর স্পষ্টতা লাভ করে। ক্রুসেডে অংশগ্রহণকারীরা মুসলিম প্রাচ্যের উন্নততর সভ্যতা-সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচিত হয় এবং উদ্বুদ্ধ হয় উন্নততর জীবনধারা লাভের আশায়। ক্রুসেডের ফলেই প্রাচ্য সম্পর্কে প্রতীচ্য লাভ করে চাক্ষুস সম্যক উচ্চতর জ্ঞান এবং কালক্রমে প্রাচ্যে তাদের ধর্ম প্রচারের ও বাণিজ্যের প্রসারতার পথ উন্মুক্ত হয়ে পড়ে।

* মুসলিমদের বিশদভাবে জানতে প্রাচ্যবিদ্যা চর্চা শুরু হয় প্রতীচ্যে। কুরআন, হাদীস, আরবী ভাষা ও সাহিত্য, যুক্তি ও জ্ঞান-বিজ্ঞনের উপর প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠে।

যুদ্ধে মুসলমানদেরকে পরাজিত করতে না পেরে প্রাচ্যবিদ্যা চর্চার নামে এবং বিশ্বব্যাপি খৃস্টধর্ম প্রচারের মাধ্যমে খৃস্টানরা বিজয় লাভের চেষ্টায় মত্ত হয়ে উঠে, যার রেশ চলছে আজো।

* ক্রুসেডের ফলে ইউরোপবাসী মুসলমানদের নিকট থেকে লাভ করে মেরিনার্স কম্পাসের ব্যবহার, সুগন্ধী দ্রব্য-মসলাদি, উন্নতমানের কৃষিপদ্ধতি ও শিল্পজাত দ্রব্যাদি সম্পর্কে প্রত্যক্ষ জ্ঞান। স্বদেশে ফিরে গিয়ে তারা প্রাচ্য দেশীয় সম্পদের চাহিদা সৃষ্টিতে অবদান রাখে।

* ক্রুসেড যুদ্ধ দ্বারা ইউরোপের একটা মহা উপকার এই হয়েছিল- ইউরোপের জাতিসমূহের মধ্যে অখণ্ড ইউরোপের চেতনা সৃষ্টি হয়। নিজেদের মধ্যে অনৈক্য ও অন্তর্দ্বন্দ্ব থাকা সত্ত্বেও নিজেদের সম্মিলিত দুশমন মুসলিমদের বিরূদ্ধে তাদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সর্বদা একই ছিল এবং তারা মুসলিমদের বিরূদ্ধে ঐক্যবদ্ধ ছিল। অখণ্ড ইউরোপের এই চেতনা সর্বদাই কোনও না কোন পন্থায় সজীব ছিল। ইউরোপের সম্মিলিত বাজার ও ইউরোপীয় ইউনিয়ন এই অখণ্ড ইউরোপের চেতনারই প্রতিধ্বনি।

* ক্রুসেড যুদ্ধের ফলে ইউরোপের শক্তির মানদণ্ডও পরিবর্তিত হয়ে যায়। বায়জানটাইন সালতানাতের পরিবর্তে পশ্চিম ইউরোপের ফ্রান্স শক্তির কেন্দ্রে পরিণত হয়। কারণ ফ্রান্স ক্রুসেডে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছিল এবং সর্বপ্রথম আওয়ায এখান থেকেই উত্থিত হয়েছিল।

* ক্রুসেড যুদ্ধের আরেকটি ফল এ হয়েছিল- এশিয়া ও আফ্রীকার ধন-সম্পদ ইউরোপীয় ক্রুসেডারদের চোখ খুলে দেয়। ইউরোপীয় চিন্তাবিদ ও পণ্ডিতগণ যে কোনভাবে উক্ত সম্পদ হস্তগত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। সেই সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের কলঙ্কময় ইতিহাস তো সকলেরই জানা।

* ক্রুসেডযুদ্ধে পরাজয়ের পর ইউরোপের পণ্ডিত ও গীর্জাধিপতিগণ জ্ঞান-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে মুসলমানদেরকে পরাজিত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। তাই প্রাচ্যবিশারদের (অরিয়েন্টালিজম) অন্তরালে, আরবী ও ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞানের সংরক্ষণ ও গবেষণার নামে ইসলাম ও নবী-রাসূলদের সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণা ছড়াবার দুরভিসন্ধি চরিতার্থ করে। প্রকৃতপক্ষে পশ্চিমা খৃস্টানদের এ জঘন্য আক্রমণ ক্রুসেড যুদ্ধ হতেও অত্যধিক বিপজ্জনক বলে প্রমাণিত হয়।

* সুদীর্ঘ ক্রুসেডকালের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকে প্রতীচ্যবাসী নিজেদের অভাবগুলো সম্পর্কে বিশেষভাবে অবহিত হল। সঙ্গে সঙ্গে সেসব অভাব দূরীকরণের প্রয়োজনীয়তাও তারা অনুভব করল। এই অনুভবই তাদেরকে জাগিয়ে তুলল অশিক্ষা-অজ্ঞানতা-অন্ধ বিশ্বাসের অতল থেকে। যা তাদের নেই তা-ই অর্জন করার দুর্জয় বাসনা জেগে উঠল তাদের মনে। ক্রুসেডে ব্যর্থকাম প্রতীচ্য এবার প্রাচ্য বাণিজ্যের নতুন পথ আবিষ্কারের নেশায় মরিয়া হয়ে উঠল। মুসলিমদের নিয়ন্ত্রণ এড়িয়ে কী করে প্রাচ্যের, বিশেষ করে ভারতবর্ষের উপকূলীয় অঞ্চলে পৌঁছানো যায়, তা-ই হয়ে উঠল তাদের রাত-দিনের চিন্তা। ক্রুসেডারদের দুঃসাহসী স্বভাবই শেষ পর্যন্ত অনুসন্ধানী ও আবিস্কার যুগের জন্ম দেয়। (প্রফেসর আতিয়া)

তারা অশিক্ষা অজ্ঞানতা অন্ধবিশ্বাস ঝেড়ে ফেলে নবোদ্যমে এগিয়ে চলল সম্মুখপানে। আর বিজয়ী মুসলমানগণ আবারো উদাসীনতা, অলসতা, নীতি নৈতিকতার ক্ষেত্রে অবক্ষয় এবং জ্ঞান ও বুদ্ধিবৃত্তির ক্ষেত্রে পশ্চাদপদতার শিকার হয়ে পড়ে।

* ১৪৯২ সালের জানুয়ারিতে রাজ-রাণী ফার্ডিন্যান্ড-ইসাবেলার বাহিনী স্পেনের মাটি থেকে নিশ্চিহ্ন করে দিল মুসলিম অধিকারের শেষ চিহ্নটুকু। যে স্পেনের মুসলিম সভ্যতার আলোকে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছিল এতদিনের অন্ধকারাচ্ছন্ন ইউরোপ, যে স্পেনের উচ্চশিক্ষার কেন্দ্রগুলো থেকে সমগ্র ইউরোপে ছড়িয়ে পড়েছিল জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলো, সেই স্পেন থেকে শুধু মুসলিম রাজত্বই নয়, সমগ্র মুসলিম জনগোষ্ঠীকে দানবীয় মত্ততায় সমূলে নিপাত করে দিয়েছিল খৃস্ট ধর্মানুসারী ক্রুসেডাররা।

(প্রতীচ্য মুসলিম সভ্যতার জ্ঞান অর্জন করেছে প্রধানত- তৎকালীন মুসলিম অধ্যুষিত সিসিলি ও স্পেনের মাধ্যমে, এরপর ক্রুসেডের মাধ্যমে)

মুসলিম নিধনকারী রাজা-রাণী ফার্ডিন্যান্ড-ইসাবেলার চোখে সেদিন নব বিজয়ের স্বপ্ন। আর সেই স্বপ্নে উদ্বুদ্ধ হয়েই তারা জেনোয়াবাসী নাবিক ক্রিস্টোফার কলম্বাসকে দিলেন এক চার্টার ও প্রচুর অর্থ, যার বলে বলীয়ান হয়ে কলম্বাস পশ্চিমের সমুদ্রপথে জাহাজ ভাসিয়ে আবিস্কার করবেন ভারতবর্ষ হয়ে চীনে পৌঁছার পথ।

* কলম্বাসের সমুদ্রযাত্রার উদ্দেশ্য সম্পর্কে এবং তখনকার খৃস্টানরা ইসলাম অনুসারীদেরকে কী চোখে দেখত তার প্রমাণ পাওয়া যায় ঐ সমুদ্রযাত্রা প্রসঙ্গে স্পেনের 'উপকারী'দাতা রাজা-রাণীকে সম্বোধন করে লেখা কলম্বাসের অভিভাষণ থেকে- 'ইয়োর হাইনেস, খৃস্টবিশ্বাসের সাগ্রহী প্রচারক, সৎ খৃস্টান ও ক্যাথলিক রাজ-ব্যক্তিত্ব হিসেবে এবং তেমনিভাবে মোহামেট (মুহাম্মদ) অনুগামীদের ও অন্যান্য পৌত্তলিক-ধর্মবিরোধীদের শত্রু হিসেবে প্রাচ্যের এই দেশটিতে (ভারতবর্ষে) পাঠিয়ে সেখানকার রাজন্যবর্গ, মানুষ, লোকালয়, সেসবের বিন্যাস ও যাবতীয় ব্যাপারে এবং এসব অঞ্চলকে আমাদের পবিত্র ধর্মবিশ্বাসের আওতায় ধর্মান্তরিত করার উপায় সম্পর্কে অবগত হওয়ার জন্যে আমাকে, ক্রিস্টোফার কলম্বাসকে পাঠানোর পরিকল্পনা গ্রহণ করেন'।

জলপথ আবিস্কারের বাইরে এই সমুদ্রযাত্রার উদ্দেশ্য যে খুবই 'মহৎ' ছিল তাতে আর ভ্রান্তি কোথায় !

* সমুদ্রযাত্রা আরম্ভ করলেন নাবিক কলম্বাস। কিন্তু ভাগ্যের কী লীলা- ভারতবর্ষ ও দূরপ্রাচ্যে পৌঁছার জন্যে জাহাজ ভাসিয়ে শেষমেষ পৌঁছে গেলেন এক নতুন মহাদেশে। অফুরন্ত প্রাকৃতিক ও খনিজ সম্পদে ভরপুর এক বিশাল মহাদেশ আমেরিকায়! অভূতপূর্ব অপ্রত্যাশিত আবিষ্কার। আর তাতেই খুলে গেল সমগ্র অভাবগ্রস্ত প্রতীচ্য এবং সেই সঙ্গে খৃস্টধর্মানুসারীদের জন্যে পরম এক সৌভাগ্যের দ্বার।

প্রফেসর আতিয়ার কথায়- বাস্তবিক এই যুক্তি প্রদান হঠকারিতা হবে না যে, **আমেরিকা আবিষ্কার ছিল ক্রুসেড-আন্দোলনেরই এক পরোক্ষ অবদান**, বিশ্ব ইতিহাসের এক নব বিকাশের রক্ষণমূলক অবদান।

কলম্বাসের সমুদ্রযাত্রার অল্প কিছুদিন পরই পর্তুগালের বাণিজ্যিক জাহাজ নিয়ে আফ্রিকার উত্তমাশা অন্তরীপ ঘুরে ভাস্কো ডা গামা এসে পৌঁছল ভারতবর্ষের উপকূলীয় ক্ষুদ্র রাজ্য মালাবারের বিখ্যাত বাণিজ্য বন্দর কালিকটে। ১৪৯৮ সালে।

তারপরের ইতিহাস ইউরোপীয়ানদের (পর্তুগীজ, ওলন্দাজ, ফরাসী, ইংরেজ) দানবীয় চরিত্র প্রকাশের ইতিহাস, বাণিজ্যের নামে তাদের লুণ্ঠন ও অকথ্য অত্যাচারের ইতিহাস, এতোদ্দেশীয় মুসলিম রাজশক্তিকে কূটকৌশলে নির্মূল করার ইতিহাস !

* মানবজাতির ইতিহাসে ষোড়শ শতাব্দীর শেষ ও সপ্তদশ শতাব্দীর শুরু ছিলো এমনই এক গুরুত্বপূর্ণ ও ভাগ্যনির্ধারণকারী যুগ, যার সুস্পষ্ট ছাপ ও প্রভাব আমরা দেখতে পাই পরবর্তী শতাব্দীগুলোতে।

ইউরোপ তখন দীর্ঘ নিদ্রা থেকে জেগে উঠেছে এবং বিপুল উদ্দীপনা ও উন্মাদনা নিয়ে এগিয়ে চলেছে, যাতে দ্রুততম সময়ে পিছনের অজ্ঞতা ও মূর্খতার ক্ষতিপূরণ হতে পারে। জীবনের প্রতিটি অঙ্গনে তাদের উন্নতির গতি ছিলো বিস্ময়কর। আপন লক্ষ্যের পথে তারা কেবল দৌড়ে যাচ্ছিল না বরং ডানা মেলে উড়ে চলছিল।

উপরোক্ত সময়কালে ইতিহাসের পাতায় বিভিন্ন জাতি ও জনগোষ্ঠীর স্থান ও অবস্থান নতুনভাবে বিন্যস্ত হচ্ছিল। কারো ভাগ্যতারকা ছিলো উদয়ের পথে, কারো ভাগ্যতারকা ছিলো অস্তাচলে। তখনকার প্রতিটি মুহূর্ত ছিল কয়েক দিন এবং একটি দিন ছিল কয়েক বছরের সমান। সুতরাং এ যুগসন্ধিক্ষণে সামান্য সময়ও নষ্ট করার অর্থ ছিল বহু দীর্ঘকাল নষ্ট করা।

কিন্তু হায় আফসোস, মুসলিম উম্মাহ তখন শুধু দিন, মাস ও বছর নয়, বরং বহু যুগ ও বহু প্রজন্মের অপচয় করেছে। পক্ষান্তরে ইউরোপের জাতিবর্গ প্রতিটি মুহূর্তের সদ্ব্যবহার করেছে এবং জ্ঞান-গবেষণা ও বিজ্ঞানসাধনার সকল অঙ্গনে বছরে যুগের পথ অতিক্রম করেছে।

দুর্ভাগ্যজনকভাবে মুসলিম শক্তি ক্রুসেড-বিজয়ের ফসল ঘরে তুলে সমৃদ্ধশালী হতে পারেনি; বরং বিজিত খৃস্টানরাই রেনেসাঁ বা নবজাগরণের সূর্যালোকে স্নাত হয়ে বিভূষিত হল নবযুগ স্রষ্টার গৌরবে।

ক্রুসেডের গভীর প্রভাবসমূহ:

দীর্ঘকালব্যাপি এ সংঘর্ষ ও মিলনের প্রভাব বহু ব্যাপ্তিময় হয়। রাজনীতি, সমাজনীতি, ব্যবসা, সাহিত্য, সংস্কৃতি, শিল্প, চারুকলা, সমরবিদ্যা এবং শিক্ষার উপর গভীর প্রভাব ফেলে।

ক্রুসেড শাসনের দু'শত বৎসর কালে কখনো কখনো কোথাও উভয় জাতি পরস্পরে হৃদ্যতা ও ভালবাসাময় পরিবেশেও জীবন যাপন করেছে, তাদের মাঝে বাণিজ্যিক ও অর্থনৈতিক সম্পর্কও প্রতিষ্ঠিত ছিল। কিন্তু ক্রুসেডের মাধ্যমে এখানে বসতি স্থাপনকারীদের যখন মুসলমানদের সাথে মেলামেশা বৃদ্ধি পেল তখন তারা জানতে পারল যে, যে জাতিকে তারা কাফের বলে ধারণা করেছিল তারা কেবল আহলে কিতাবই নয়, বরং এমন প্রত্যয় এবং সভ্যতা সংস্কৃতির ধারক, ইউরোপবাসী যা কল্পনাও করতে পারেনি।

* মুসলমানদের সংস্পর্শে আসা জনগণের জন্যে ইসলাম আশীর্বাদ স্বরূপ হলেও অধিপতি, শাসক ও যাজকদের জন্যে তা ছিলো এক জ্বলন্ত অভিশাপ। ইসলামকে তাই কলুষিত করতে হবে। তার আসল রূপ যাতে জনগণ জানতে না পারে তাই তাকে উপস্থাপন করতে হবে ঘৃণ্য ও বিকৃত অবয়বে। ইউরোপের অধিপতি, শাসক ও যাজকেরা এ কাজে সর্বশক্তি নিয়োগ করল। অসংখ্য মিথ্যা ও উপকথা ছড়ানো হল। হিংসাত্মক গাল-গল্প রটানো হল। বক্তৃতায়-রচনায়-ধর্মসভায় ইসলামকে হাজির করা হল দানবীয় অবয়বে। অব্যাহত থাকল ভয়াবহ প্রচারণা। ফলে পশ্চিমা জনজীবনে এর তীব্র ও প্রচণ্ড প্রভাব পড়ল।

* ১৮৯৬ সালে ফরাসী লেখক কাউন্ট হেনরি তার 'ইসলাম' গ্রন্থে লেখেন- 'কল্পনাও করতে পারি না মুসলমানরা কী ভাববে, যদি তারা মধ্যযুগীয় উপকথাগুলো শুনতে পায়। যদি তারা জানতে পারে খৃস্টানরা তাদের নিয়ে কী ধরণের স্তোত্রগীতি রচনা করত! আমাদের সকল স্তোত্র, এমনকি বার শতকের পূর্বের স্তোত্রগুলোও একটিমাত্র ধারণা থেকে বিকশিত হয় এবং ক্রুসেড এর পেছনে প্রধান ভূমিকা রাখে।এ সকল স্তোত্র ইসলাম ধর্মের প্রতি সম্পূর্ণ অজ্ঞতা ও মুসলিমদের প্রতি চরম বিদ্বেষে পূর্ণ ছিল। এ সব গানের প্রভাব ইউরোপের মানুষের মনে ইসলাম সম্পর্কে তীব্র ঘৃণা গেঁথে দিয়েছিল। এক ধরণের বিধ্বংসী ধারণা তাদের চেতনায় প্রোথিত হয়েছিল। যা আজো তাদের মধ্যে বিরাজমান। প্রত্যেকেই মুসলিমদেরকে বর্বর, অবিশ্বাসী ও মূর্তিপূজারী হিসেবে বিবেচনা করত'।

ক্রুসেডের ঠিক কিছু আগে রচিত জ্বালাময়ী সংগীত 'শ্যাজো দ্যা রোঁলা' এবং ইউরোপীয় সাহিত্যের অন্যতম কবি দান্তের 'ডিভাইন কমেডি' এর নিকৃষ্টতম উদাহরণ।

‘ওরিয়েন্টালিজম’ গ্রন্থে এডওয়ার্ড সাঈদ লেখেন- ‘দান্তে কর্তৃক ইসলামকে কাব্যিকভাবে উপস্থাপন বৈষম্য ও বিকৃতি সম্পন্ন এক পরিকল্পনা। প্রায় সৃষ্টিতাত্তিক অপরিহার্যতার নযীর। এর আশ্রয়েই ইসলাম ও তার নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ সম্পর্কে পশ্চিমের ভৌগলিক, ঐতিহাসিক এবং সর্বোপরি নৈতিক ধারণার সৃষ্টি হয়’।

এই যে ‘ঐতিহাসিক, ভৌগলিক ও নৈতিক ধারণা’ , ইউরোপ একে কখনো ত্যাগ করেনি। তাদের সভ্যতার রঙ-রূপ বদলেছে, রেনেসাঁ-রিফর্মেশন হয়েছে, অসংখ্য দিক ও বিষয়ে তাদের দৃষ্টিভঙ্গি পাল্টেছে, কিন্তু ইসলামের ব্যাপারে আগের অবস্থান তারা পরিবর্তন করতে পারেনি।

* মুহাম্মদ আসাদ লেখেন- ‘ইউরোপীয় সভ্যতার শৈশবাবস্থার উপর দাঁড়িয়ে আছে ইসলামের প্রতি নিদারুণ বিদ্বেষ। ইসলামের বিরূদ্ধে প্রতীচ্যের যুগ যুগ লালিত শত্রুতা -যা আদতে ছিল ধর্মীয়- আজো অবচেতন মনে তা টিকে আছে। ক্রুসেডের ছায়া আজো প্রসারিত হয়ে আছে পাশ্চাত্য সভ্যতার উপর। পাশ্চাত্যের লোকেরা আজকের দিনে ইসলাম সম্পর্কে যা চিন্তা করে এবং অনুভব করে, তার শেকড় রয়েছে সেই সব গভীর প্রভাবের ছাপ এবং স্মৃতির ছাপের মধ্যে, যা জন্ম নিয়েছিল ক্রুসেডের সময়’।
‘পোপ দ্বিতীয় আরবান তার ক্লারমেন্টের বিখ্যাত বক্তৃতায় যখন পবিত্রভূমি দখল করে রাখা ‘পাষণ্ড জাতি’র বিরূদ্ধে যুদ্ধের জন্য উদ্বুদ্ধ করেন, তখন তিনি সম্ভবত তার নিজের অজান্তেই পাশ্চাত্য সভ্যতার চার্টার বা সনদ ঘোষণা করেন’।

আজও যে ইউরোপ-আমেরিকা মুসলিমবিশ্বকে প্রতিটি ময়দানে পরাস্ত করবার ও মুসলমানদেরকে প্রতিটি ক্ষেত্রে নিম্নতম দেখাবার চেষ্টায় তৎপর হয়ে আছে তা সেই ক্রুসেড-অনুপ্রেরণারই প্রতিক্রয়া বা ফলশ্রুতি। ভারতীয় উপমহাদেশকে অন্যায়ভাবে বণ্টন, কাশ্মীর সমস্যা, ইসরাঈলে জবরদস্তিমূলক ইহুদী-রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা, ১৯৬৫ সালে সুয়েজ খালে অন্যায় আক্রমণ, পাক-ভারত যুদ্ধে হিন্দু-ভারতকে সর্বপ্রকার সহযোগিতা, ১৯৬৭ সালের যুদ্ধে আরবদের পরাজয়ের পর বিজয়োল্লাস প্রকাশ,............ এবং ইসরাঈলের হটধর্মী ভূমিকার উপর রহস্যজনক নীরবতা আর অপরদিকে .... –এসবই প্রকৃতপক্ষে ক্রুসেডারদের সেই ঘৃণা ও শত্রুতার ফসল, যার বীজ তারা স্বীয় বংশধরদের অন্তরে রোপন করে গেছে।

হাজার বছর ধরে পশ্চিমা মন ইসলাম প্রশ্নে যে বিষফলের আবাদ করে চলেছে, তার ভাঁড়ারের চাবি হচ্ছে ক্রুসেড।

ক্রুসেড শেষ হয়নি এখনোঃ

ক্রুসেড কখনো শেষ হয়নি। খৃস্টানগণ কর্তৃক একাদশ শতকে শুরু করা ক্রুসেডের সমাপ্তি ঘটেছিল ত্রয়োদশ শতকে মুসলমানদের বিজয়ের মধ্য দিয়ে। কিন্তু খৃস্টীয় ইউরোপ সে পরাজয়কে যে বহুদিন ধরে মেনে নিতে পারেনি তার প্রমাণ মিলে পরবর্তীকালে বারবার তাদের মুসলিম শক্তি নির্মূল অভিযান থেকে। ইতিহাসে এ পর্ব পরিচিত হয়ে আছে ‘পরবর্তী ক্রুসেড’ নামে।

১৩৯৬ সালে সংঘটিত নাইকোপলিসের যুদ্ধই ‘পরবর্তী ক্রুসেড’ এর শেষ যুদ্ধ। উদীয়মান তুর্কী শক্তির বিরূদ্ধে, বলতে গেলে কি, তুর্কী শক্তিকে সমূলে ধ্বংস করার লক্ষ্যেই ইউরোপীয় খৃস্টান শক্তি এগিয়ে এসেছিল। ইউরোপের সকল রাজ্যই অংশগ্রহণ করেছিল এই যুদ্ধে। অন্যদিকে তুর্কী সুলতান বায়েযীদের নেতৃত্বে ছিল লাখো সৈন্যের এক তুর্কী বাহিনী। শেষ পর্যন্ত ক্রুসেডারদের রক্তে রঞ্জিত হয়ে উঠল নাইকোপোলিসের রণাঙ্গন। পরোপুরি বিধ্বস্ত হল প্রতীচ্যের খৃস্টান বাহিনী। এই বিপর্যয়ের খবর ইউরোপকে গভীর দুঃখ ও আতঙ্কে আচ্ছন্ন করে দিয়েছিল।

তুর্কী সাম্রাজ্য অতপর বিস্তৃত হয়েছে দক্ষিণ-পূর্ব ইউরোপে। আড্রিয়ানোপলের পর বাইজানটাইনে স্থাপিত হয়েছে তুর্কী মুসলিমদের রাজধানী। ১৪৫৩ সালের পর কনস্টান্টাইনের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হয়েছেন তুর্কী সুলতান দ্বিতীয় মুহাম্মদ ও তার বংশধরেরা। মোরিয়া ও অর্কিপেলেগো সহ আশেপাশের ল্যাটিন পকেটগুলো অন্তর্ভুক্ত হল তুর্কী সাম্রজ্যে। তারপর তার বিজয়াভিযান পরিচালিত হল পূর্ব-মধ্য ইউরোপের পথে। ভিয়েনা দ্বারপ্রান্ত পর্যন্ত এসে গেল তাদের অধিকারের সীমানা।

‘পরবর্তী ক্রুসেড’ এর পরও দেখা যায় ‘আরও পরবর্তী ক্রুসেড’। সবগুলোতেই পরাজিত হয় খৃস্টশক্তি। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে মুসলিম শক্তি নিজেদের গাফলতের কারনে এই বিজয়ের ফসল ঘরে তুলে সমৃদ্ধশালী হতে পারেনি; বরং বিজিত খৃস্টানরাই রেনেসাঁ বা নবজাগরণের সূর্যালোকে স্নাত হয়ে বিভূষিত হল নবযুগ স্রষ্টার গৌরবে।

ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, খৃস্টানদের করায়ত্ত এই নবযুগে জ্ঞানে-বিজ্ঞানে-কৌশলে-শক্তিতে বলীয়ান হয়ে তারা মুসলিম প্রতিপক্ষকে ধ্বংসের নবতর উপায় উদ্ভাবনে নিজেদেরকে নিয়োজিত করে। ফলে মধ্যপ্রাচ্য ও প্রাচ্যাংশের এই ভারতবর্ষেও তারা ছুটে আসে নিজ স্বার্থ উদ্ধার ও বহুকাল পোষিত মুসলিম-বিদ্বেষ চরিতার্থতার লক্ষ্যে। মুসলিম শক্তির উদাসীনতা, অলসতা ও চারিত্রিক অবক্ষয়ের সুযোগে তারা সে লক্ষ্য অর্জনে সফলও হয়। ভারতবর্ষের মুঘল-শক্তিকে ধ্বংস করে তারা ভারতবর্ষের অধীশ্বর হয়ে বসে। ইউরোপীয় খৃস্টশক্তির এসব কর্মকাণ্ডকেই চিহ্নিত করা হয় 'আরও পরবর্তী ক্রুসেড' নামে। অন্তত ১৯১৭ সাল পর্যন্ত খৃস্টীয় ইউরোপের মন থেকে ক্রুসেড বিকার দূর হয়নি।

ক্রুসেড এখনো শেষ হয়নি। বসনিয়া ফিলিস্তীন কাশ্মীর ও পৃথিবীর অন্যান্য ভূভাগে মুসলমানদের বিরূদ্ধে খৃস্টান-ইহুদী-ব্রাক্ষ্মণ্যবাদী শক্তির কর্মকাণ্ড কি সেই ক্রুসেডকেই স্মরণ করিয়ে দেয় না ?। একাদশ শতকের জেরুজালেম উদ্ধারের নামে নারকীয় তাণ্ডবলীলা, আঠার শতকের পলাশী আর হাল আমলের বসনিয়া, ফিলিস্তীন, কাশ্মীর, পূর্ব তিমুর, দক্ষিণ সুদান একই সূত্রে গাঁথা।

* এমনই পরিস্থিতিতে ইসলাম অনুসারীদের আত্মরক্ষার প্রয়োজন তো জরুরী হয়েই দাঁড়ায়। এবং এ আত্মরক্ষা যেহেতু বৈরী শক্তির সঙ্গে মোকবিলারই নামান্তর মাত্র, সেহেতু মোকাবিলার প্রতিটি প্রান্তরে যোগ্যতা অর্জন করাই হবে মুসলিম উম্মাহর আশু করণীয় কাজ। সে যোগ্যতা জ্ঞান-গুণ ও শক্তি অর্জনের মাধ্যমে শত্রুর মোকবিলা করার যোগ্যতা, অন্যায়ের বিরূদ্ধে ন্যায় প্রতিষ্ঠার যোগ্যতা, সর্বোপরি মানব মুক্তির লক্ষ্যে আল্লাহ-রাসূলের নির্দেশিত অনুসৃত পথে চলবার যোগ্যতা। এসব যোগ্যতা অর্জন করেই শুধু আমরা আশা করতে পারি আল্লাহর রহমত। আমাদের ধর্মীয় ও পার্থিব সম্মান, শান-শওকত, অর্থসম্পদ সবই আল্লাহর আনুগত্যের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত।

সূরা বনী ইসরাঈলে বর্ণিত ইহুদীগণ কর্তৃক হযরত মূসা ও ঈসা আ. এর শরীয়ত থেকে মুখ ফেরানোর কারণে ভিন্ন জাতির মাধ্যমে তাদেরকে ভয়াবহ শাস্তি দানের ঘটনা কুরআনে কারীমে বর্ণনা করে আমাদেরকে শোনানোর উদ্দেশ্য বাহ্যত এটাই যে, মুসলমানগণও এ খোদায়ী বিধি-ব্যবস্থা থেকে আলাদা নয়। অর্থাৎ যখন মুসলমানগণও আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য থেকে বিমুখ হয়ে যাবে, তখন তাদের শত্রু ও কাফেরদেরকে তাদের উপর চাপিয়ে দেয়া হবে, যাদের হাতে তাদের উপাসনালয় ও মসজিদসমূহের অবমাননা হবে(তাফসীরে মাআরিফুল কুরআনঃ সূরা বনীইসরাঈল-মুফতী শফী র.)।

তথ্যসহায়িকা: ১. তাফসীরে মাআরিফুল কুরআন ২. ক্রুসেডের ইতিবৃত্ত ৩. প্রাচ্যবিদদের দাঁতের দাগ ৪. ইযহারুল হক ৫. বাইবেল কি ঐশীগ্রন্থ ৬. মণ্ডলীর ইতিহাস পরিচিতি ৭. খৃস্টমণ্ডলীর ইতিহাসে নারী ৮. বাইবেল ৯. ব্রিটানিকা (ক্রুসেডস নিবন্ধ) ১০. মুসলিম উম্মাহর পতনে বিশ্বের কী ক্ষতি হল ১২. ইসলামী বিশ্বকোষ ৯ম খণ্ড (ই.ফা.বা.) ১৩.সংগ্রামী সাধকদের ইতিহাস (১ম খণ্ড) ১৪. আলবিদায়া ওয়ান নিহায়া

মুহাম্মদ মুরশিদুল ইসলাম
৯. ৩. ২০১৬ ঈসায়ী
দা'ওয়াহ ও তুলনামূলক ধর্মতত্ত্ব বিভাগ
জামিয়াতুল উলূমিল ইসলামিয়া, মুহাম্মদপুর, ঢাকা।